বর্ষ বিভ্রাটে মুসলমান

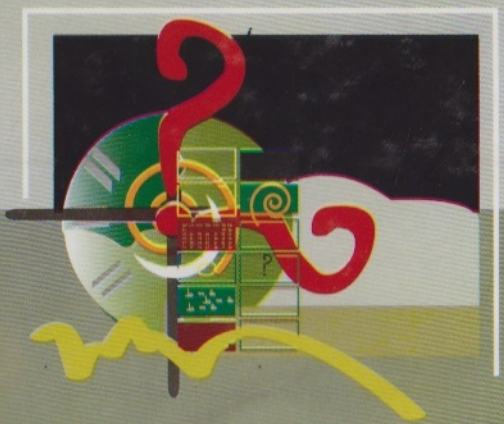

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার
জেলা জজ (অবঃ)

বর্ষ বিভ্রান্তে মুসলমান

মোঃ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার
সাবেক এডভাইজারঃ (অব) জেলা জজ
গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
এডভোকেটঃ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

পরিবেশক
ইখওয়ান লাইব্রেরী
৩৪/২, নর্থব্রুক হল রোড বাংলাবাজার,ঢাকা-১১০০।
ফোন ঃ ৭১৬৩২৩৮

www.pathagar.com

বর্ষ বিভ্রাটে মুসলমান

মোঃ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার

প্রকাশকাল ঃ জুন-২০০৪ইং
রবিউস সানি-১৪২৫ হিজরী

স্বত্ব ঃ লেখকের নিজস্ব

প্রকাশক ও পরিবেশক ঃ
মাওঃ মোঃ শাহজাহান (ম্যানেজার)
ইখওয়ান লাইব্রেরী
৩৪/২, নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৩২৩৮

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র।

Barsha Bibrate Musnlman. Written by **Md Shirajul Islam Talukder** (Retd. District judge) Published By **Ekhwan Library** 34/2, NorthBrook Hall Road. Banglabazar, Dhaka—1100

Price : Tk. 50.00 (Fifty only) Us $ One 1.00 (One)

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. ভূমিক# ৫
২. বর্ষ কি এবং কেন? # ৮
৩. বাংলা নববর্ষ # ১২
৪. ইংরেজি বর্ষ # ২২
৫. হিজরী বর্ষ # ২৭
৬. ইরানের নওরোজ # ৩২
৭. চিনের নববর্ষ # ৩৭
৮. শরিয়তের দৃষ্টিতে চন্দ্র ও সৌর হিসাবের গুরুত্ব # ৩৮
৯. শেষ কথা # ৫৪

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মরহুম নানা নূর শরিফের নামে অত্র পুস্তকটি উৎসর্গ করা হলো। কারণ তিনি তার কর্মজীবনে হিজরী সনকেই বেশী গুরুত্ব দিয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আমি একজন বাংলাদেশী মুসলমান। আমার জন্মলগ্ন থেকে বাংলা নববর্ষের হালখাতা, মেলা, নবান্ন খাওয়া ইত্যাদি দেখে আসছি। ছোটবেলায় নববর্ষের বৈশাখী মেলায় যেতাম এবং সেখান থেকে মাটির তৈরি ঘোড়া এবং কাঁচা আম খাবার জন্য চাকু কিনে আনতাম। এগুলো দামেও সস্তা। দুই এক আনা হলেই সবকিছু কেনা যেত। বাবা সাথে হিন্দু দোকানদারের গদিতে গিয়ে হাল খাতার মিষ্টি খাওয়ার আনন্দ আজও মনে পড়ে। নববর্ষের এ সকল অনুষ্ঠানগুলোর মাঝে তখনকার দিনে যে আনন্দ ছিল, উহাতে যেমন আন্তরীকতা ছিল, তেমনি কোন অশ্লিলতার অবক্ষয় ছিল না। আজকে যেমন নববর্ষকে নিয়ে হানা-হানি, দলিয়করনের প্রচেষ্টা, অপসংস্কৃতির অবগাহন, বোমাবাজি ইত্যাদি সেদিনকার নববর্ষে চিন্তাও করা যেতো না।

আজ বড় হয়ে কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে একজন বিচারক হিসেবে যখন বিবেচনায় বসি তখন মনের প্রশ্ন এ বলে আমাকে নাড়া দেয় যে, তুমি বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত নববর্ষের নামে যা করছো উহা কি আদৌ আল্লাহর মনোনিত ধর্মের সহায়ক কোন সংস্কৃতি? বাংলারই শুধু নয়–যে-কোন নববর্ষ যদি আমাদের ধর্মীয় অনুশাসনের অনুষ্ঠানাদী না হয়, তবে এ ধরনের অনুষ্ঠান মূলতঃ মুসলামানদেরকে তাদের অজ্ঞাতে জাহান্নামেই নিয়ে যাবে। কারণ একজন মুসলমান হিসেবে আজকে শুধু বাংলা নববর্ষই নয়, অধিকন্ত ইংরেজদের প্রচলিত মাস বা দিনগুলো মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় এবং উচ্চরণযোগ্যও হতে পারে না। অথচ মুসলমানদের জীবনের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে বিজাতীয় এবং বিধর্মীয়ভাবে গণনার দিন, মাস ও বছরগুলো এমনভাবে গেড়ে বসেছে যে, আজ মুসলমানেরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির কোরানিক নিদ্দের্শ বেমালুম ভুলে গিয়ে একটি শেরক মিশ্রিত বর্ষ পুজার সংস্কৃতিতে কৃত্রিম এবং অশ্লিল আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে।

আল্লাহ পাক আনন্দকে অস্বীকার করে না। সৃষ্টির সমস্ত প্রাণিই আনন্দ করতে চায়। সেক্ষেত্রে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে তো অবশ্যই আনন্দ করতে হবে। কারণ, আনন্দই আত্মার জীবন। নিরানন্দ দিয়ে নির্জীব করে আত্মাকে আপ্লুত করা যায় না। আত্মাকে যদি আনন্দ দিয়ে আপ্লুত করা না যায়, তবে জীবনের জন্য যে কর্ম উহার করণ কার্য্যতঃ সম্ভব হতে পারে কি? একটি মানুষ সে কোন কিছুতেই আনন্দ পায় না। সে নিরাশার নিরানন্দ নিয়ে নির্জীব হয়ে নিজকে নিয়েই ব্যস্ত। সে কি পারবে ছালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ও

www.pathagar.com

জিহাদের যুদ্ধে শরীক হতে? এমনকি সে তার নিজের শ্রষ্টা আল্লাহকেও চিনতে পারবে না। কারণ আল্লাহকে চেনার জন্য যে চেতানার চাঞ্চল্যতা থাকতে হবে উহা প্রকটিত হবে জ্ঞানের আনন্দে। কিন্তু নিরানন্দ আত্মা দিয়ে নিরাকার জ্ঞানের গবেষণা সম্ভব নয় বলেই আত্মার আনন্দ জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য্য। আর জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর দেয়া খেলাফতী দায়ীত্ব পালিত হতে পারে। তাই আনন্দ ধারাকে সংযত এবং সঠিক জায়গায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

তবে আনন্দের নামে বর্ষপূজার এহেন ধারা যদি চলতেই থাকে তাহলে মুসলমানদের আত্মা কলুষিত হবে এবং আমি মনে করি কালের বিবর্তনে মুসলমানদের মুসলমান হওয়ার স্বকীয়তায় কোরানের যে নির্দেশ উহা হতে তাদের পদস্খলন প্রকারন্তরে তাদের জাহান্নামে যাবার কারণ হবে। বিচারকের এ বিবেচনাকে সামনে রেখেই আমি এ পুস্তকটি লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। পাঠকদের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে উহা আল্লাহই ভাল জানেন। পুস্তকটিতে মহাকাল থেকে আহরিত বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন জাতীয় বর্ষানুসরণ এবং উহাদের দিনক্ষণের বিভিন্ন আনন্দ উৎসব আলোচিত হয়েছে। সর্বপরি বর্ষ বিভ্রাটের বিভ্রান্তি থেকে মুসলমানদের করণীয় কি হতে পারে সে দিক নির্দেশনাও বইটিতে আলোচনা হয়েছে। মুসলমানদের মনে রাখতে হবে যে, ভৌগলিক সীমায় সংস্কারের সংস্কৃতি শুধু শেরকই জন্ম দেয় না, অধিকন্তু উহা ইকবালের ভাষায় ঃ

"উন তাজা খোদাও সে, উতান সবচে বড়া হ্যায় ইয়ে উনকা পিরহান হ্যায় মিল্লাত কাকাপন হ্যায়" অর্থাৎ কোন ভৌগলিক সীমায় জাতীয় পরিচয় ঐ জাতীর জন্য সৌন্দর্যকর পোশাক হতে পারে। কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের জন্য উহা মুদ্দারের কাফন সমতুল্য।

সুতরাং মুসলমানদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত যে সময় বা কালের যোগসূত্রতা উহাকে একটি বিশেষ ভূ-খণ্ডের কথিত সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে আমরা যেন মুসলিম উম্মার আন্তর্জাতিক অবস্থান থেকে সরে না দাড়াই। মনে রাখতে হবে আল্লাহ মানুষকে ঐক্যের আহ্বানে তাঁর পক্ষে খেলাফতী কাজের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন উহা কথিত সংস্কৃতির কারণে কুসংস্কারের সংঘাত নিয়ে দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করবে। ইসলামিক পরিভাষায় উম্মাহ শব্দটি "জাতী" শব্দটির শাম পর্যায়ের বিষয় নয়। কেননা জাতী গড়ে উঠে একটি জনগোষ্ঠির সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানের ও অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে উম্মাহ গড়ে উঠে একটি আদর্শের ভিত্তিতে। আর ঐ আদর্শের ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ এবং একাত্ববাদের বিশ্বাস এবং তা আল-কোরান কেন্দ্রিক হতে হবে। এ ধরনের বিশ্বাসে যারা বিশ্বাসী তারা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন তারা পরস্পরের ভাই এবং একে অপরের সুভাকাঙ্ক্ষি। তাই দেখা যায় যে, ১৯৭১ সনে যে ভারত বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে তাদের ভ্রাত্র প্রতিম ভাই পাকিস্তান থেকে আলাদা করে দিল, সেই

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তান ও ভারতের ক্রিকেট খেলায় বাংগালীরা পকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে এবং পাকিস্তানের সাফল্যে তারা উৎসাহী। ইরাকের জনগণ মুসলিম উম্মাহর অংশের কারণে আগ্রাসী আমেরীকার বিপক্ষে দাড়িয়েছে। সুতরাং উম্মাহর সংস্কৃতিক মূল্যবোধ তাওহীদ বিশ্বাসের পরিপুরক না হলে উম্মার মূল্যায়ন হতে পারে না। আর এ কারণেই আমি উম্মাহর ঐক্যের অবদানে বর্ষবরণের যে সত্যতা উহাকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাই। যাতে আমরা সত্যিকার অর্থের নববর্ষের হাকিকতকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আকড়ে ধরে উভয় জগতের শান্তির সন্ধ্যান নিতে পারি। আমি এ প্রত্যাশা নিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে এ প্রার্থনা করছি, তিনি যেন বিষয়টিকে সুন্দরভাবে যুক্তিপূর্ণ তথ্য দিয়ে পাঠকদের সামনে উত্থাপন করতে পারে। আমীন।

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার
লেখক।

www.pathagar.com

বর্ষ কি এবং কেন

গানিতিক নিয়মে বর্ষ হলো মহাকালের এক ক্ষুদ্রতম সময়, যাহা ক্ষুদ্রতম মুহূর্ত বা সেকেন্ড তথা তদাপেক্ষও ক্ষুদ্রতম একটি মুহূর্ত দিয়ে সৃষ্টি। সমস্ত সৃষ্টিই এ মহাকালের আবর্তে তাদের নিজ নিজ কর্ম-কাণ্ডের কর্মে আবর্তীত হয়ে চলছে। কালের যেমন ক্ষয় নেই, তেমনি মহান আল্লাহ পাক তার সৃষ্টি সমস্ত কিছুকেই পরকালের অনন্ত এবং ইহকালের অসীম সীমারেখায় বেঁধে রেখেছেন। গনিতিক নিয়মে বর্ষকে মাস, দিন, ঘন্টা, মিনিট এবং সেকেন্ড বা মুহূর্ত দিয়ে হিসেব করা হলেও পরকালের হিসেব গনিতিক নিয়মের বাইরে একটি অনন্ত মহাকালের একক ধারায় প্রবাহমান থাকবে।

পৃথিবীর গণিতিক নিয়মের ঐ ক্ষুদ্রতম মুহূর্তগুলো মানুষ তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করবে এ প্রত্যাশায় পরম করুনাময় আল্লাহ চন্দ্র-সূর্যের উদয় অস্তের মাধ্যমে সময়ের ধারাবাহিকতা নির্ধারন করে দিয়েছেন। মানুষ ঐ ধারাবাহিকতার কাল, বর্ষ, মাস, দিন, ঘন্টা এবং মুহূর্তকে উপেক্ষা করে বাঁচতে পারার কথা কল্পনাও করতে পারে না। প্রশ্ন উঠতে পারে যে বর্ষের এহেন ধারাবাহিকতা কেন? মূলতঃ উহাতে মানুষের কর্মের শৃঙ্খলবোধ বেধে দেয়া। নিয়মতান্ত্রিকভাবে মানব জীবনে সময়ের ঐ সম্পৃক্ততা না থাকলে সৃষ্টির কর্মকান্ডের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে সৃষ্টির সৌন্দয্য এবং উহার উদ্দেশ্য ব্যহৃত হতো।

বর্ষের হিসেব যে শুধু মানুষের বেলায় প্রযোজ্য তেমনটি নয়, বরং অন্যসৃষ্টিকুলের গাছ-পাতা, তরুলতা, পশু-পাখি, নদীর পানির জোয়ার-ভাটা সাথেও ঐ সময়ের সম্পৃক্ততা রেখে দেয়া হয়েছে। উপমার উপস্থাপনায় আমরা যদি গাছ-পালা, তরুলতা ইত্যাদিকে সময়ে বাইরে বিবেচনা করি তবে উহাদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে বেড়ে না ওঠার কারণে মানুষের প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হবে না। আর সেক্ষেত্রে মানুষের কর্মকাণ্ডে এ সৃষ্টির ব্যবহার যথাযথ পালিত না হবার কারণে মানুষকে তার স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করাও সম্ভব হবে না। অথচ মানুষকে দেয়া খেলাফতী কর্মকাণ্ডের জবাবদিহির জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের কর্মের তাৎপর্য্যকে কালের কারণ দিয়ে অনুধাবন করার জন্য তাঁর অহির আয়াত দিয়ে বলে দিলেন ঃ

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থঃ "কালের শপথ, মানুষ মূলতঃ বড় ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। সেই লোকদের ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে ভালো উপদেশ দিয়েছে ও ধর্য্য ধারনের উৎসাহ দিয়েছে" (সূরা-আছর)

www.pathagar.com

কালের কোন বিলুপ্তি নেই। যেমন নেই আল্লাহ ছোবাহানো তায়ালার কোন বিলুপ্তি। তাই কালের মাধ্যমেই আল্লাহর অস্তিত্বের অনুভূতি বিরাজমান। বর্ষ সেই অনুভূতিকে আঘাত করে, মহাকালের নিয়ন্ত্রণের মালিক আল্লাহ এবং খেলাফতি দায়ীত্ব নেয়া মানুষ তার জবাবদিহির কথা স্মরণ করতে পারে। পূর্বাদৃত সূরার মাধ্যমে অহিকৃত আয়াতের মহাকাল সংক্রান্তের শপথ দিয়ে মানুষের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহির যে তাৎপর্যমূলক বাণী আল্লাহ তায়ালা রেখে দিয়েছেন ঐ সবগুলোর সাথে গনিতিক হিসেবের বর্ষ, মাস এবং সেকেন্ডের যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয় না কি? মানুষ কি এমন কোন কাজ করতে পারবে যেখানে কাল বা মুহূর্তের প্রয়োজন পড়বে না? মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং পরোলৌকিক বিষয়ের যে কর্মকাণ্ড উহা যদি ঐ আয়াতের অনুকরণে না হয়, তবে বর্ষবরণে যে সত্যটি কোরানে অহি করা হয়েছে উহার সাথে সংঘঠিত হয়ে মানুষ মূলতঃ ক্ষতিগ্রস্থই হবে। তাই এবাদত বলি, পুজা বলি, অথবা নেহাত ধ্যান বলি সমস্তটাই আল্লাহ মহাকালের মুহূর্তগুলোর মাধ্যমে এমনভাবে বেঁধে দিয়েছেন যেন মানুষ আজ একটি মুহূর্তের জন্যও যেন উহা হতে অবসর নিতে পারছে না। তার প্রতিটি মুহূর্ত সে সময়ের সাথে তথা বর্ষের সাথে বেঁধে নিয়েছে।

সময় অথবা কালের বিষয়টি শুধু একক কোন মানুষের অথবা অন্যকোন একক সৃষ্টির জন্যও নয়; বরং সাকুল্যে সমস্ত সৃষ্টিই এ সময়ের বাধনে বাঁধা পড়েছে। তাই চন্দ্র-সূর্যের এবং গ্রহ-নক্ষত্রের আবাহমানকালের আবর্তনে তাদের উদয় অস্তের অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় নাই। কারণ তাদের সাথে অন্যসৃষ্টির অস্তিত্বের প্রশ্নটিও জড়িত আছে। একদিন যদি আকাশে সূর্য না উঠে, তখন সময় ও সৃষ্টির কি ধরনে বিপর্যয় ডেকে আনবে উহাকে মুহূর্তের জন্য কল্পনা করা যাবে? অথচ মুহূর্তের চিন্তাটিও ঐ সূর্যের উদয় অস্তের মাঝেই নিহিত রয়েছে। কারণ সমস্ত সৃষ্টিই মূলতঃ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জন্য নিবেদিত। কেননা মানুষকেই আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ـ

অর্থ ঃ সে সময়ের কথা কল্পনা করে দেখ, যখন তোমাদের রব ফিরেস্তাদের বললেন যে, আমি পৃথিবীতে এক খলিফা নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক (২ ঃ ৩০) আর এটা করা হলো এ কারণে যাতে মানুষ সময়ের ও বর্ষের কারণকে বিবেচনা করে আল্লাহর দ্বীনের প্রকাশে পরম পরাকাষ্ট দেখাতে পারে।

যিনি বা যারা অন্যের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন, তাদের প্রতিপালন তাকেই করতে হয়, যিনি প্রতিনিধি পাঠান। প্রতিনিধিত্ব যেমন কোন স্থায়ী বিষয় নয়, তাই মানুষকে অবশ্যই সময়ের বিবেচনা দিয়ে তার প্রতিপালকের পুরস্কারের আশায় তাঁর কাছেই ফিরে

www.pathagar.com

যেতে হবে। ঐ ফিরে যাবার ব্যাপারে আল্লাহ পাকও তাঁর আল-কোরানে বলে দিলেনঃ

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

অর্থ ঃ "হে মানুষ তুমি তীব্র আকর্ষণে নিজের শ্রষ্টার দিকেই চলে আসতেছো এবং তাঁর সাথেই তোমাদের সাক্ষাৎ হবে" (৮৪ ঃ ৬)

আর তাকে দেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আল্লাহর সাথে এহেন সাক্ষাৎ ঘটবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন—

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ـ

অর্থ ঃ "কাহারো কর্ম সময় পুর্ণ হয়ে যাবার মুহুর্ত এসে পড়ে, তখন আল্লাহ তাকে কক্ষনই অধিক অবকাশ দেন না, আর মানুষ যা কিছু করে আল্লাহ সে বিষয় পূর্ণ ওয়াকিফহাল রয়েছেন" (৬৩ ঃ ১১)

ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুধু মানুষই নয়, বরং সমস্ত প্রাণীকেই মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। এ ব্যাপারেও আয়াতে এসেছে—

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ـ

অর্থঃ "প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। পরে তারা সকলেই আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে (২৯ ঃ ৫৭)

কারণ খেলাফতী দায়ীত্ব পালনে যে কর্মসূচি এবং উহার বাস্তবায়নের জন্য যে সময়-সীমা বেধে দেয়া হয়েছিল উহা কতটুকু পালিত হয়েছে বা আদৌ হয় নাই এগুলোর জবাবদিহি মৃত্যুর পরেই শুরু হবে। পরীক্ষার প্রয়োজনে যেমন পরীক্ষার হলে সময়সীমা বেধে দেয়া হয়েছিল; তেমনি বর্ষের বাধন দিয়ে কর্মের কারণগুলোকে পরীক্ষার বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। তাই জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে আল্লাহর আয়াত বলে দিলেন

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ـ

অর্থঃ "তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন যেন তোমাদেরকে পরখ করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মাঝে আল্লাহ পাকে আয়াতের আমলে দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?" (৬৭ ঃ ২)

উপরের উদৃত আয়াতগুলো থেকে পাঠকদের সামনে যে দর্শনটি তুলে ধরেছি উহা হলো এই যে, আল্লাহ মানুষকে চন্দ্র-সূর্যের উদয় অস্ত দিয়ে যে বর্ষের বিবেচনা করেছেন উহা হলো পৃথিবীর এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রয়োজনে আল্লাহ প্রদত্ত খেলাফতী দায়ীত্বের কর্মগুলো সময়োচিত সমাধান বের করা। কারণ তিনি পরকালের পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েই প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। প্রনিধিত্বের প্রয়োজনে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পৃথিবীতে ব্যস্ত থাকি উহাকে অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিকভাবে সময়ের সীমা দিয়ে সাজাতে না পারলে

www.pathagar.com

প্রতিনিধিত্বের দায়ীত্বে আমাদের ব্যর্থতার কারণে পুরুস্কারের পরিবর্তে শাস্তিই পাবো। তাই সময়সীমার মাঝে যে মৃত্যু এবং জীবন উহার উদ্দেশ্যে অনাক্ষাংকিত ও অপ্রত্যাশিত কোন অপসংস্কৃতি দিয়ে দায়ীত্বহীনভাবে আমাদের চলা উচিত হবে কি? হবে না। সুতরাং মানুষকে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে , তাদের জন্য কোন বর্ষ পঞ্জিকাটি অনুকরণীয়? সেক্ষেত্রে একাধিক নববর্ষের উৎযাপন সংক্রান্তের কিছু তথ্য পাঠকদের সামনে তুলে ধরলে তারা অবশ্যই অনুকরণীয় বর্ষটি লুফে নিতে পারবেন। আমি যেহেতু একজন বাংলাদেশীয় মানুষ। তাই প্রথমে বাংলা বর্ষকেই আলোচনায় তুলতে চাই। কারণ বাংলা নববর্ষ উৎযাপনই আমাকে এ পুস্তকটি প্রকাশে উদ্ভদ্য করেছে।

www.pathagar.com

বাংলা নববর্ষ

স্বীকৃত মতে যে কোন নববর্ষের বরন ও বর্জন সংশ্লিষ্ট জাতীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা আছে। বাংলা নববর্ষ ও তেমনি একটি দিবস যেখানে বাংগালীরা দিবসটির উৎযাপনে অভূত আনন্দ পায়। কিন্তু সমস্যা হলো মুসলমানদের জন্য। কারণ নববর্ষের ১লা বৈশাখের দিবসটিতে যে সকল অনুষ্ঠানাদী এবং বছরটির মধ্যকার মাস ও দিবসগুলোর নামকরণ ইসলামের জীবন বিধানে গ্রহণযোগ্যতা পায় নাই। বাংলাদেশের কিছু মানুষ বুদ্ধিজীবি হবার কারণে অন্যসকলকে ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানাদি দিয়ে এ কথা বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, ১লা বৈশাখ বাংগালী জাতীর জাতীয় সংস্কৃতি। হতে পারে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য ১লা বৈশাখ সহ বাংলা বর্ষটি তাদের সংস্কৃতি। কিন্তু মুসলমানদের জন্য উহা আসলে কোন সংস্কৃতি হতে পারে না, বরং উহাতে পাপের বড় ধরনের শেরকী রয়েছে। তাছাড়া সংস্কৃতির সংজ্ঞ্যা দিতে গিয়ে বিজ্ঞ মনিষীরা যে সকল বাণী রেখে গেছেন উহার সাথে এদেশের মুসলিম মানুষদের বাংলা নববর্ষের কর্মকাণ্ডের কোনই যোগসূত্রতা নেই।

সংস্কৃতি সংক্রান্তের বিষয়গুলো যে কোন ভৌগলিক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের কথিত বুদ্ধিজীবিরা উহা অনুধাবন করতে পারছেন না। তাদের জন্য মনীষি শওকত ওসমানের একটি বাণী উদৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন ঃ

"সংস্কৃতির কোন দেয়াল নেই। সীমান্ত নেই, সংস্কৃতি বিশ্বের সম্পদ। যে সংস্কৃতিতে বিশ্ব মানবতার স্পর্শ নেই, সেটা সংস্কৃতি নয়।"

সংস্কৃতি মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত। তাই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ তার মর্যাদা এবং সৌন্দর্যের বিপরীত এমন কোন অপসংস্কৃতিতে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। এর সমর্থনে আমরা মনিষী আবুল হাসানাত সাহেবের একটি কথার উদ্ধৃতি তুলে দিতে পারি। তিনি বলেছেন ঃ

"সংস্কৃতি ও সজ্জীবন আমার কাছে একার্থবোধক। Cultured লোক বললে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে এমন লোকদের ছবি যিনি সজ্জীবনের অধিকারী। সজ্জীবন (Good Life) কে বাদ দিয়ে কোন সংস্কৃতিরই আমি ধারনা করতে পারি না এবং সে রকম সংস্কৃতি আমার কাছে কিছুমাত্রও শ্রদ্ধার বস্তু নয়।"

উল্লেখিত বাণীর পরেও আমাদের দেশের এক ধরনের বুদ্ধিজীবিরা বাংগালী সংস্কৃতি হিসেবে ১লা বৈশাখ উৎযাপন করে। এহেন উৎযাপনের বিষয়গুলোর মধ্যে থাকে রমনা

www.pathagar.com

বটমূলে নারী-পুরুষের অশ্লিল আচরণে পানিভাত খাওয়া; পশু-প্রাণির মুখোশ পরে মর্তন কুর্তন; সংস্কৃতি অনুষ্ঠান নামের কিছু নাচ ও সংগীতানুষ্ঠান। ঐগুলো আদৌ মানুষ বিশেষ করে মুসলমানদের জীবন বিধানের কোন কর্মকাণ্ডে মূল্যায়ীত হয় না। কারণ অশ্লিতা অপরাধকে জন্ম দেয়। নীতিগতভাবে কোন সংস্কৃতিই অশ্লিলতাজনিত অপরাধের উৎসহ যোগায় না। সংস্কৃতিতো সুন্দর করে মানুষকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। উন্মাদোনা এবং অশ্লিলতা মূলতঃ সংস্কৃতি হীনতা, যাহা স্বর্গের পথ নয়। এ কথার সমর্থন যোগায় মনীষি জজ মেরিডিথ সাহেবের বাণী থেকে। তিনি বলেন ঃ

"সংস্কৃতি স্বর্গের অর্ধেক পথ, সংস্কৃতি হীনতা নারকীয়"।

আমাদের বাংলাদেশে নববর্ষের নামে ১লা বৈশাখে যা করা হচ্ছে উহা কি নারকীয় নয়? কবি শামছুর রহমান সাহেব বলেছেন–

"সংস্কৃতি হলো সুন্দরভাবে বাঁচা। প্রবলভাবে বেচে থাকা। এ সুন্দরভাবে এবং প্রবলভাবে বেঁচে থাকা শব্দ দুটি তিনি অবশ্যই কোন অশ্লিল এবং ভৌগলিক সীমার কোন সংস্কৃতিকে বুঝাতে চান নাই। ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে সংস্কৃতি কোন ভৌগলিক ভুখণ্ডের সীমায় নয়, বরং প্রতিটি মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে প্রকাশিত হয়। আর যা সুন্দর তাই সংস্কৃতি। এবং এ কারণে সুন্দর সবদেশে সকল মানুষের জন্যই সুন্দর। সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হচ্ছে আচার-অনুষ্ঠান এবং রীতি-নীতি। এ আচার-অনুষ্ঠানাদী এবং রীতি-নীতিগুলো ধর্মীয় বিশ্বাসের বাইরে বিবেচনা করার অবকাশ নেই। কারণ ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীত কোন আমল দিয়ে তিনি তো তার স্রষ্টা আল্লাহকে খুসি করতে পারছেন না। তাই যদি হয় তবে সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই নরক বা জাহান্নামের ঝুকি নিতে হবে। কোন আল্লাহ বিশ্বাসী মানুষ কি ঐ ঝুকি নিতে পারবে? আসলে সংস্কৃতিই হচ্ছে সজ্জীবনের চালিকা শক্তি অথবা এও বলতে পারি যে, সজ্জীবনই সুন্দরতর সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটায়। কেননা মানুষকে নিয়ে এবং দিয়েই সজ্জীবনের সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাংলাদেশের বাংলা নববর্ষ নিয়ে যে উৎসবাদী হচ্ছে উহা আদৌ সংস্কৃতি নয়। তাছাড়া যে দিবসটিকে এত ঘটা করে উৎযাপন করা হলো বাংগালীদের জীবনে এর প্রয়োগই বা কোথায়? কারণ বাংলা বর্ষের কোন তারিখ দিয়ে এদেশের তেমন কোন কার্যক্রম পরিচালিত হয় না। বরং হিন্দু সমাজের লোকেরা তাদের পুজা-পর্বনে হিজরী বছরের চন্দ্র-সূর্যের উদয় অস্তের আমবস্যা এবং পূর্ণিমার মূল্যায়ন করলেও মূলতঃ সারাটি বছরের দিনক্ষণের সাথে এদেশের অধিকাংশ লোকেরাই ইংরেজি বর্ষের ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে।

প্রচলিত বাংলা বর্ষের প্রচলন তেমন কোন দাবির প্রেক্ষীতে প্রবর্তিত হয় নাই। যখন বাংলা বর্ষ চালু হয়, তখন ভারতে কয়েক বছর ধরে হিজরীসন প্রচলিত ছিল। কিভাবে এবং কেন এই বাংলা বর্ষের চালু হলো উহার কিছু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা যেতে

www.pathagar.com

পারে। সেকালের সম্রাজ্যের অন্যতম শাসক বাদশাহ আকবর আজ থেকে সাড়ে তিনশত বছর আগে বাংলাসন প্রবর্তন করেন। এ তথ্য আজ সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। তার সময় অর্থাৎ ৯৬৩ হিজরীতে বাংলাসন চালু হয়। ঐ সময় শস্যের মাধ্যমে খাজনা তোলা হতো। কৃষকরা যখন শস্য তুলে ঘরে তুলতো, তখন বাদশাহর খাজনা আদায়কারীরা গিয়ে খাজনা আদায় করে নিয়ে আসতো। খাজনা আদায়কারীরা হিজরী সনের তারিখ অনুযায়ী প্রত্যেক বছর একই সময় খাজনা আদায় করতে যেত। কিন্তু পর পর লিপ-ইয়ারে বছরের কারণে কৃষকদের ঘরে শস্য ওঠা সম্ভব না হবার কারণে খাজনা আদায় বিপত্তি ঘটতো। আমরা ৩৫৩ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৩৪ সেকেণ্ডে আর্থাৎ মোটামোটিভাবে ৩৫৪ দিনে এক চন্দ্র বছর হয়। প্রত্যেক মাস সাধারণতঃ ২৯ দিনে হয়ে থাকে। কোন কোন সময় কোন একটি মাস ৩০ দিনেও হতে পারে। অন্যদিকে সৌরবছর হয় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড, অর্থাৎ মোটামোটিভাবে ৩৬৫ দিনে। বাকি সময়টির হিসাব মিলানোর জন্য চার বছর পর একদিন বাড়ীয়ে ৩৬৬ দিন করা হয়। অর্থাৎ লিপইয়ার বছর। তা হলে হিজরীসনের সাথে ইংরেজি সনের ব্যবধান দাঁড়ায় ৩৬৫–৩৫৪ = ১১ দিন। অর্থাৎ প্রত্যেক বছর হিজরী সন সৌরবছর থেকে ১১ দিন এগিয়ে যায়। এজন্যে হিজরী সনের কোন নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে যখন তারা খাজনা আদায় করতে যেতো, তখন দেখা যেতো যে কৃষকদের ঘরে ফসল ওঠেনি বা তারা তখনও ফসল কাটেনি। এর ফলে খাজনা আদায়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো।

এহেন একটি পরিস্থিতিকে সামাল বা সমাধান দেয়ার জন্য সম্রাট আকবর দায়ীত্ব দিলেন তার সভাসদদের মধ্যে অন্যতম খ্যাতিমান পুরুষ ইরানের সিরাজ নগরীর আমীর ফতে উল্লাহ সিরাজীকে। তিনি হিজরীসনকে খাজনা আদায়ের সুবিদার জন্য সৌরসনে রূপান্তরীত করলেন যা পরবর্তিতে ফসলীসন নামে অবিহিত হলো। ঐ ফসলীসনই আজকের দিনের বাংলাসন। ঐ সন নির্ধারনের ফলে খাজনা আদায়ের সময় উদ্ভুদ্য সমস্যাগুলো কেটে গেল এবং তখনকার সমাজের বাংলার সংখ্যাধিক্য ও প্রভাবশালী হিন্দু সমাজ এ ধরনের একটি পরিবর্তনকে তারা লুফে নিলো এ কারণে যে এতে মুসলিম তথা ইসলামী ঐতিয্যের হিজরীসনের প্রভাব থেকে তারা মুক্তি পেল এবং সাথে সাথে হিন্দু ধর্মের দর্শন দিয়ে বছরের মাস, দিনক্ষণ ইত্যাদির নামকরণ করে মুসলমানদের ঈমান ও আকিদায় শেরকী ঠুকিয়া দিল। অর্থাৎ এ ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা তাদের ধর্মীয় সংস্কারগুলোকে সময়ের সাথে মিলিয়ে নিতে পারলো। হিন্দু সমাজ এ ধরনের পরিবর্তনে খুশি হলেও মুসলিম ঐতিয্যের সাথে এর কোনই মিল ছিল না। খাজনা তোলার অজুহাতে ১০ দিনের একটি ব্যবধান বিবেচনায় এহেন একটি বর্ষের এবর্তন আকবরের দিনে ইলাহী নামক ধর্মটির কর্মকাণ্ডের একটি অংশ হিসেবে চালুর প্রয়াশ পেল। একজন

www.pathagar.com

লম্পট সম্রাট সুশাসনের নামে যে সংস্কার করে গেলেন তার প্রভাব থেকে আজও মুসলমানরা মুক্তি পায় নাই। বরং ইসলামের বিধি-বিধানের বিপরীত বিধান চালু করে সংস্কারের নামে যে সংস্কৃতি দিয়ে গেলেন, উহার প্রভাব বলায়ের অংকিত অপসংস্কৃতির আমল মুসলমানদেরকে আল্লাহ থেকে ইতিমধ্যে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। যে বিশ্ব নবীর স্মৃতি বিজড়ীত হিজরতকে কেন্দ্র করে আল-কোরআনের আয়াতের আলোকে হিজরীসন চালু ছিল, উহাকে ৯৬২ বছর পরে ১৫৮৪ খৃস্টাব্দে এহেন পরিবর্তন করে সম্রাট আকবর মুসলমানদের ঈমান ও আকিদার যে ক্ষতি করে গেছেন উহাকে পুরন করার সময় আর হয়তো ফিরে আসবে না।

কারণ এ অঞ্চলের মুসলমানরা মুসলিম ঐতিয্যের কোরানিক পরিভাষার আরবী ভাষার হিজরী সনের মহররম, ছফর, রবিউল আউয়াল, রবী উছ সানি, জমাদি উল উলা, জমাদিউস সানি, রজব, সাবান, রমজান, শাওয়াল, ঝিলকদ, ঝিলহজ্জ নামগুলো ভুলে গিয়ে লম্পট সম্রাটের উছিলায় বাংলা বর্ষের যে নামকরণ হয়েছে উহা সবটাই হিন্দু ধর্মের পুজ্য নক্ষত্র দেবাতাদের নামকরনে সাজানো। যেমন–বৈশাখা, জ্যৈষ্ঠা, পুর্বাষাঢ়া, শ্রাবণা, পুর্নভাদ্র, পদ, অশ্বীনি, কৃতিকা, মৃঘশিরা, পুষ্যা, মঘা, পুর্ব ফাল্গুনী ও চৈত্রা, যা পরবর্তিতে বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবন, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রাহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র নামে বাংলা মাসগুলোর নাম করন করা হয়েছে।

এ বার মাসকে কেন্দ্র করে হিন্দু ধর্ম দর্শনে দেব-দেবীদের পুজ্য বিষয়ের যে বিবেচনা তারও কিছু তথ্য তুলে ধরলে মুসলমানরা বুঝতে পারবেন যে, কি ধরনের সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে হিন্দু সমাজ বাংলা নববর্ষের উৎযাপনের আয়োজন করে। হিন্দু শাস্ত্রমতে নক্ষত্রের প্রকার শুধু কারটাই নয়। বরং ২৭ (সাতাইশ) প্রকারের নক্ষত্রকে তারা বিভিন্নভাবে পুজা করে আসছে। এ সকল নক্ষত্র হলো–১. অশ্বীনি ২. তরনী ৩. কৃতিকা ৪. রোহিনী ৫. মৃঘশিরা ৬. ভাদ্রা ৭. পুনবর্বসু ৮. পুশ্যা ৯. অশ্লেষ ১০. মঘা ১১. পুর্বভাল্গুনা ১২. উত্তর ফাল্গুনী ১৩. হস্তা ১৪. চিত্রা ১৫. স্বাতী ১৬. বিশাখা ১৭. অনুরাধা ১৮. জৈষ্ঠা ১৯. মুলা ২০. পূর্বাষাঢ়া ২১. উত্তরষাড়া ২২. শ্রাবনা ২৩. ঘনিষ্ঠা ২৪. শতভিষা ২৫. পুর্বভাদ্র পদ ২৬. উত্তর ভাদ্র পদ ও ২৭. বেরতী।

ঐ সকল নক্ষত্রের পূজ্য বিষয় হলো নিম্নরূপ। অস্বীদিন নক্ষত্রের অধিপতি অস্বীনি কুমারদয়, তরুনীর যস, কৃতিকার অগ্নী, কোহিনীর ব্রাশ্যা, মৃগশিরার চন্দ্র, আদ্রার শিব, পুর্নববসুর অসিতি, পুষ্যার বৃহস্পতি, শ্লেষার সর্প, মঘাব পিতৃযন, পূর্বফাল্গুনীর যোনী, উত্তর ফাল্গুনীর অঘ্যাস, হস্তার দিবাকর, চিত্রার বিশ্বকর্ম, স্বাতীর পবন, বিশাখার ইন্দ্র ও অগ্নী, অনুরাধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার ইন্দ্র, মুলার রক্ষিস, পুবর্বাষাঢ়ার জল, উত্তরাষাঢ়ার বিশ্ব, অভিজিতের ব্রক্ষ্যা, শ্রবনার হরি, ধনিষ্ঠার বসু, শততিবার বরুন, পুর্ববভাদ্র পদের আজ

www.pathagar.com

পাদ, উত্তর ভাদ্র পদের অহিব্রধ ও বৈরতীর অধিপতি পূষ্যা। উত্তরাষাঢ়ার শেষপাদ। শ্রবনার প্রথম চারি দন্তকে অভিজিৎ বলে। হিন্দু ধর্মের এহেন ধর্মদর্শনে তারা ধ্যান করলে মুসলমানদের কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু মুসলিম হবার পরে ইসলামী দর্শনের যে আকিদা বিশ্বাস সেখানে বিশাখার ইন্দ্রা ও অগ্নী দেবতাদয়কে বসানো হলে উহা নেহাত শেরকী ছাড়া অন্য কি হতে পারে? তবু মুসলমানরা বাংগালী সংস্কৃতি হিসেবে ১লা বৈশাখের উৎযাপন করবে কি?

এভাবে হিন্দু সমাজ শুধু মাসকেই নয়, অধিকন্তু সপ্তাহের ৭টি দিনের নাম করনেও নক্ষত্র দেবতাদের নামের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। যেমন–১. শনিবার ২. রবিবার ৩. সোমবার ৪. মোঙ্গলবার ৫. বুধবার ৬. বৃহস্পতিবার ও ৭. আল ইয়াওমে জুমাকে শুক্র গ্রহের নামে শুক্রবার করে সপ্তাহের ৭ দিনের নামকরণ করে নিয়েছে। এর পরে সপ্তাহের এ সপ্ত গ্রহের সাথে হিন্দু ধর্মের জ্যোতিষী বিজ্ঞানীরা মানুষের হস্তরেখার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে মানুষের কল্যাণ অকল্যাণের ভাগ্যের বিধি হিসেবে হাতের রেখা গননার তথ্য আবিষ্কার করেছে এবং সেখানে মানুষের রাশিচক্রকে বিন্যাস করে ভাগ্যের উত্থান পতনের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। ইদানিং রাশিচক্রের ব্যবসাহ বেশ জমে উঠেছে। নবযুগের ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা থেকে উহার কিছু তথ্য তুলে ধরা যেতে পারে।

হস্তরেখাবিদদের মতে হাতের কোন কোন জায়গায় কি কি গ্রহ মানুষের জন্য কি কল্যাণ ও অকল্যাণের কথা বলেছে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা থাকলে বুজদার মুসলমানদের আকলে আঘাত লাগলে হয়তো বা তারাও ইসলামী ঐতিয্যের হিজরীর সনের মূল্যায়ন করতে শিখবেন। হাতের চেহারা আমরা সবাই জানি। হাতের আংগুলের নাম আছে। যেমন–বুড়ো আংগুল, কড়ে আংগুল ইত্যাদি। তেমনি আংগুলের তলার হাতের চেটোয়ে যে উচু যায়গাগুলো রয়েছে ঐগুলোকে জ্যোতিষীরা গ্রহরে নামকরণে নির্ধারণ করেছেন। যেমন বুড়ো আংগুলের পাশ উচু জায়গার নাম শুক্রস্থান। প্রথম আংগুলের (তর্জনী) নিচের জায়গার নাম বৃহস্পতিস্থান, মাঝে আংগুলের নিচের জায়গার নাম শনিস্থান, তৃতীয় আংগুলের তলার নাম রবিস্থ্যান, কুড়ে আংগুলের ঠিক নিচেই বুধস্থান। শুক্রস্থান, বৃহস্পতি, রবি ও বুধস্থানের নিচে যে জায়গা সেটা হলো মঙ্গল স্থান। বুধস্থানের একেবারে নিচে কব্জির জায়গার নাম চন্দ্রস্থান।

এখন দেখা যাক বিজ্ঞানীরা হাতের এসব বিশ্লেষন করে যা যা পেয়েছেন সেগুলো এবং জ্যোতিষবিজ্ঞানীরা স্পেকটোস্কোপ (Spectroscope) ব্যবহার করে গ্রহ সমন্ধে যা যা বলেছেন, সেগুলোর সাথে হাতের জায়গাগুলোর গ্রহ দিয়ে নাম দেবার পিছনে কোন ভিত্তি আছে কিনা। যে প্রাণীর জীবনী শক্তি দেখা যাবে তাকে উচ্চ কম্পাফেক (High Freguency field) রেখে যদি কিরলিয়ান ফটো পদ্ধতি দিয়ে ফটো নেয়া হয়, তা হলে

www.pathagar.com

দেখা যাবে যে, ঐ প্রাণীর দেহ থেকে বহু রকমের রংগের সাথে চারিদিকে ঘোরানো কতগুলো ফুটকির প্রতিবিম্ব (Refleation) পাওয়া যাচ্ছে। কিরলিয়ান ফটো পদ্ধতি মানুষের হাতে সাতটি রং অর্থাৎ কর্নালি Spectrum) প্রকাশ করেছে। যেমন বুড়ো আংগুল (শুক্রস্থান) আসমানি (Indigo)। প্রথম আংগুল (বৃহস্পতিস্থান) নীল রং (Blue), মাঝের আংগুল (শনিস্থান) বেগুনী রং (Violet), তৃতীয় আংগুল (রবিস্থান) লাল রং (Red), কড়ে আংগুল (বুধস্থান) সবুজ রং Green), বুড়ো আংগুলের উপর এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আংগুলের নীচে (মঙ্গলস্থান) হলদে রং (Yellow), বুধস্থানের নীচে এবং কব্জির উপর (চন্দ্রস্থান) কমলা রং (Orange), সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির বিজ্ঞানীরা সৌরজগতকে (Solar System) স্পে ফটোস্কোপ দিয়ে বিশ্লেষণ (Analysis) এবং পরিশিলন (Culture) করে রবি, (Anlysis) বুধ, প্রভৃতি গ্রহের রংগের পতিবিম্ব (Reflection) প্রকাশ করেছেন। সেই সব গ্রহের রং হাতের যে যে জায়গাগুলোকে আগেকার দিনের জ্যোতিষিরা গ্রহ দিয়ে বলেছেন এবং আজকের দিনে কিরোলিয়ান ফটো পদ্ধতি ঐ ঐ জায়গা যে যে রং আলাদাভাবে প্রকাশ করেছেন তার সাথে একই মিল আছে। যেমন রবি লাল (Red), চন্দ্র কমলা (Orange), মংগল হলদে (Yellow), বুধ সবুজ (Green), বৃহস্পতি নীল Blue), শুক্র আসমানী (Indigo), এবং শনি বেগুনী (Violet), আসলে বিজ্ঞানী এবং জ্যোতিষী বিজ্ঞানীদের পাওয়া পূর্বালোচিত মিলগুলো অবস্থানগত বা সৃষ্টিগত কিছু নয়, বরং একে অপরের **(Reflection)** জর্নিত রং ধারণ।

রাশিচক্রের ধারাবাহিকতায় আবার ১২টি ঘরের নাম করা হয়েছে। যেমন–১. মেষ রাশি ২. বৃশ রাশি ৩. মিথুন রাশি ৪. কর্কট রাশি ৫. সিংহ রাশি, ৬. কন্যা রাশি ৭. তুলা রাশি ৮. বৃচ্চিক রাশি ৯. ধনু রাশি ১০. মকর রাশি ১১. কুম্ভ রাশি ও ১২. মীন রাশি। ঐ রাশিচক্রকে আবার অধিপতি গ্রহদেবতাদের সাথে মিলিয়ে নিম্বরূপ করে রাখা হয়েছে। যেমন–১. মেষের মঙ্গল গ্রহ ২. বৃষের শুক্র গ্রহ ৩. মিথুনের বুধ গ্রহ ৪. কর্কটের চন্দ্রগ্রহ ৫. সিংহের রবিগ্রহ ৬. কন্যা আবারও বুধ গ্রহের সাথে মেলানো হয়েছে। ৭. তুলার শুক্রগ্রহ ৮. বৃশ্চিকের মঙ্গল গ্রহ ৯. ধনুর বৃহস্পতি গ্রহ ১০. মকরের শনিগ্রহ ১১. কুম্ভের ও শনিগ্রহ ১২. মীনের ও বৃহস্পতি গ্রহ। ঐগুলো সকলটাই মানুষের ভাগ্যচক্রের জন্য একটি বুদ্ধিভিত্তিক বিবেচনা মাত্র।

আবার ঐগুলোকে বুজাবার জন্য রাশিচক্রকে একটি বৃত্ত eirele) আকারে আঁকা হয়েছে। তাই বৃত্তের ৩৬০° কে ১২ ভাগে অর্থাৎ ৩০ করে এক একটা ঘরকে দেখানো হয়েছে। নানা দেশের নানা ভাষার লোকেরা যাতে ঘরগুলোকে বুঝতে পারে সেইজন্যে ঘরগুলোকে ভাষায় না লিখে চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। যেমন–মেষ, ভেড়ার চিহ্ন, বৃষ

www.pathagar.com

ষাড়ের চিহ্ন, মিথন নারী-পুরুষের চিহ্ন, ইত্যাদি। জ্যোতিষিরা রাশিচক্রের যে ছবি একেছেন উহার প্রতি নজর করলে দেখা যাবে যে রবি এবং চন্দ্র ছাড়া বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনির দুটো করে ঘর আছে। অর্থাৎ রবি এবং চন্দ্র ছাড়া প্রত্যেক গ্রহের দুটো করে ঘর আছে। মানে এক একটি দুটো করে রাশির অধিপতি। শুধু তাই নয়, রবির নীচ থেকে অর্থাৎ ঘড়ির কাটা যেদিক দিয়ে ঘুরে তার উল্টো দিক দিয়ে (Anticlock Wise) এবং চন্দ্রের উপর থেকে অর্থাৎ ঘড়ির কাটা যেদিক দিয়ে ঘোরে সেদিক দিয়ে Clock Wise) দেখলে বোঝা যাবে যে, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি পর পর সাজানো।

জ্যোতীষিদের সাজানো বা অংকিত রাশিচক্রের এবং সৌরজগতের ছবি দুটি খুটিয়ে দেখলে এবং এক একটি বৃত্তকে এক একটি গ্রহ হিসেবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, রবিগ্রহের সবচেয়ে কাছে আছে বুধ গ্রহ, তারপর শুক্র, পৃথিবী মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি। রাশিচক্রের এভাবে পর পর রাশির অধিপতি গ্রহকে সাজানো দেখে বোঝা যায় যে, যারা রাশিচক্র একেছিলেন তারা রবি থেকে অন্য গ্রহ কতদূরে আছে তা জানতেন। রাশিচক্র এবং সৌরজগতের এহেন সাজানো ছবি দেখে জ্যোতিষিদের মনে আবার প্রশ্ন জেগেছিল যে, সৌরজগতের শুক্রগ্রহের মাঝখানে যখন পৃথিবীগ্রহ রয়েছে তখন এ পৃথিবীকে রাশিচক্রের ছবিতে দেখানো হলো না কেন? কেনই বা রবি এবং চন্দ্রকে পাশাপাশি রাশিচক্রে রাখা হয়েছে? ঐ সকল প্রশ্নে উত্তর দিতে গিয়ে জ্যোতিরিবজ্ঞানীরা আবার বলেছেন যে, পৃথিবীর উপর নানা ধরনের ঘটনার ভবিশ্যত বাণীর জন্যে রাশিচক্রের মানচিত্র আকা হয়েছিল। তাই পৃথিবী সৌরজগতের কোথায় আছে জানা থাকলেও উহা ছবিতে দেখানো হয় নাই। প্রশ্ন দুটির উত্তরে জ্যোতিষীরা আর একটি কারণকে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, আকাশে নভোমন্ডল (Zodiac) এবং তাঁর সীমারেখা নক্ষত্রপু (Costelation) আকাশের যে যে স্থানে দেখানো হয়েছে সেটা মানুষের অসুবিধা হবে যদি পৃথিবী ঐ রাশিচক্রের ছবির ভিতরে রাখা হয়। বিজ্ঞানীরা মৌর বিকিরন মাপতে গিয়ে (Solar Radiation) আকাশে যে জায়গাটি সিংহ (রবিগ্রহ যার অধিপতি) এবং কুম্ভ (শনি যার অধিপতি) দেখানো আছে, সেই দুটো জায়গায় গরম এবং ঠাণ্ডা দেখেছেন। তাই জ্যোতিষী শাস্ত্রবিদরা অসীম রবি গ্রহকে গরম এবং শনিগ্রহকে ঠাণ্ডা চরিত্র হিসেবে আখ্যায়ীত করেছেন। এছাড়া নক্ষত্র পুঞ্জ যেটা নভোমণ্ডলের সীমারেখা, তাদের পারিবারিক তারকার যেগুলো সবচেয়ে উজ্জল তারকা তাদের Spectroscope দিয়ে যে যে প্রতিভিম্ব (Reglcetion) বিশ্লেষণ করে পেয়েছেন সেটা বললেও নাকি বুঝা যাবে যে, রাশিচক্রের ছবিতে পৃথিবীকে না দেখানোর কারণ কি ছিল। জ্যোতির বিজ্ঞানীরা গ্রহের রং দিয়ে রাশিচক্রের রং সাজিয়ে মানুষের ভাগ্যচক্রের বিবেচনা করেছেন, যা ইতিপূর্বে আলোচিত

www.pathagar.com

হয়েছে। আবার রাশিচক্রের ছবির ভিতর দর্শন বিজ্ঞানের অন্য নিয়ম (Law) বোঝানো আছে। পৃথিবীতে যা কিছু আমরা জন্মিতে দেখি এবং যেকোন ঘটনা ঘটতে দেখি তাদের সেই বিশেষ সৃষ্টির মূলে একই নিয়ম কাজ করে বলে মনে হয়। মানুষের বেলায় নজর করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর চীন, জাপান, আফ্রিকা, ভারত বর্ষ ইত্যাদি যে কোন জায়গায় যে কোন মানুষ জন্মাক না কেন তাদের জন্মাবার নিয়ম এবং পদ্ধতি একই। প্রত্যেকের বেলায় মা এবং বাবার প্রয়োজন। তাই হিন্দু জ্যোতিবীদরা চন্দ্রকে এবং রবি অর্থাৎ সূর্যকে পাশপাশি রেখে চন্দ্রকে প্রকৃতির নিয়মে মা এবং সূর্য বা রবিকে পুরুষ বা বাবা হিসেবে আখ্যায়ীত করেছেন।

তবে হিন্দু ধর্ম তথ্যে বা দর্শনে এগুলো বিদ্যার একটি বুদ্ধিভিত্তিক্ তথ্য হতে পারে–কিন্তু ইসলাম মানুষকে ঐ তথ্যের ভিত্তিতে কল্যাণ ও অকল্যাণের কথা শুনাতে যাবে না। কারণ ইসলাম মৌলিকভাবে আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং ইসলাম মানুষের কর্মের কারণকেই কল্যান বা অকল্যানের আলামত হিসেবে বিশ্বাস করে আর জ্যোতিষীদের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় ইসলামে গ্রহণযোগ্যতা নেই, এ ব্যাপারে রসূল (সঃ) এর একটি বাণী তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি বলেছেন ঃ

وَعَنْ قَبِيْصَةَ إِبْنِ امُخَارِق (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ الْعِيَافَةَ وَالطَّيْرَة وَاطَّرق مِنَ الْجِبْتَ ـ

অর্থ ঃ কাবিছাহ ইবনে মুখারীক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনে যে, আমি রসূল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ রেখা টেনে কোন কিছু দেখে এবং পাখি আকিয়ে শুভাশুভ নির্ণয় খোদাদ্রোহীতামূলক কাজ (আবু দাউদ)।

তবে সৌরজগতের ভাসমান গ্রহদীর কোন একটিরও কি ধরনের কল্যাণ মানুষের রাখা হয়েছে তার হিসেব না পেলেও এগুলোর সৃষ্টিরহস্য এবং সৃষ্টি কৌশলাদীতে মহান স্রষ্টা আল্লাহর মহত্বকেই খুজে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে The Glory of the stars এর লেখক Merlin L Neff তার পুস্তকের মুখবন্ধ থেকে একটি কথা তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি আল্লাহ প্রতি মানুষের ঈমানের জন্য বলেছেন ঃ

In this Volume eg (The glory of the stars) I have endeavared to bring the most upto date ceuthoretative findings about the starry heavens into a popular farm that will inspire greater love for the Subject and at the some time increase taith in a Peroonal God, Who ereated all things. There is no subject that should inspire the Christian more than the study of the Univeroe. We are beginning to Pout the alphabet of the starry heavens together and they spell the words God is here" In the dark hours of our

www.pathagar.com

bewildered genceation may we learn to look up for the stare still shine in eternal splendar".

Merlin L Neff সাহেবের ঐ কথাটি হলো সৃষ্টি তথ্যের মৌলিক কথা। যেখানে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে মিলিয়ে অথবা স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিকেই দেবতা গণ্যে উপসনা করার দর্শন দিয়ে বাংলা নববর্ষের যে আয়োজন করা হয়েছে উহা হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য তো নয়ই, অধিকন্ত মানুষ জাতীর জন্য শুভ হতে পারে না। অথচ সম্রাট আকবর মুসলিম হওয়া সত্বেও ইসলামের মৌলিক বিধানকে বাদ দিয়ে সুবিদাবাদী হিন্দু সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য এহেন একটি বর্ষের প্রচলন করে গেছেন। কারণ এ সময় গ্রহ-নক্ষত্র সহ ৩৩ কোটি দেবতাদের পুজারী হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই বাংলার অধিকাংশ জনগণ হিসেবে বসবাস করতো। যে আকবর আল্লাহর মনোনিত ইসলামকে বাদ দিয়ে দ্বীনে ইলাহী নামের ধর্ম প্রবর্তনে হিন্দু সম্প্রদায়কে খুশি করে রাজ্য শাসন করতে চেয়েছেন, তার প্রবর্তিত বাংলা বর্ষ আদৌ যে মুসলমানদের সংস্কৃতি হতে পারে না এ বোধ আজ বাংলার অধিকাংশ মুসলমানদের নেই বললেই চলে। নববর্ষের আনন্দ উৎসবকে বাংলাদেশের কিছু মানুষ বাংগালী জাতীর জাতীয় সংস্কৃতির মাঝে ধরে রাখতে গিয়ে যে অকৃতিম এবং অশ্লিল উৎসবাদী নিয়ে আসতে চায় উহা অধিকাংশই আদিম এবং আমেরীকার রোড ইন্ডিয়ানদের অনুষ্ঠানাদীর অনুকরণ। কিন্তু মুসলমানদের উৎসবাদীতে কোরান বহিভূত কোন উৎসবের আয়োজন আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন আল-কোরানে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ـ

অর্থ ঃ "আমরা মানুষকে অতিব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি।" (৯৫ ঃ ৪) অথচ পহেলা বৈশাখের উৎসবাদীতে ধর্মনিবীশেষে কিছু লোক বিশেষ করে মুসলমানদের সন্তানরা বানর, কুকুর, গরু ইত্যাদি পশু-পাখির মুখোশ পরে উৎসবাদীতে মেতে উঠে।

যে ফসলের কারণে এহেন ফসলের বছরের সৃষ্টি, সেই উৎসবাদীতে ফসলের কোন মূল্যায়ন নেই। ১লা বৈশাখে রমনা পার্কের মাঠে নারী-পুরুষের অশ্লিল আচরনে পানি ভাত, নাচ-গান ইত্যাদি কিছু অনুষ্ঠানাদী ছাড়া বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান মানুষের কর্মজীবনে কোন কর্মকাণ্ড দেখতে পাওয়া যায় না। হিন্দু সমাজের কিছু লোক তাদের পুজা পার্বনে, হিসেবের হাল-খাতা, চন্দ্র-সূর্যের উদয় অস্তের কারণে আসা আমাবস্যা এবং পুর্ণিমার মূল্যায়ন করলেও মূলতঃ সারাটি বছরের দিনক্ষনের সাথে এদেশের অধিকাংশ লোকই ইংরেজি বর্ষের ব্যবহার করে আসছেন। যখন বাংলাসন চালু হয় তখন ভারতে কয়েকশত বছর ধরে হিজরীসন প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবরের এহেন বছরের প্রবর্তন দেখে মনে হয় যেন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে হিজরীসন থাকার কারণে সেখানে ফসল উৎপাদন বা খাজনা আদায় হচ্ছে না। মোগল সম্রাজ্যের পতনের অনেকগুলো কারণের

www.pathagar.com

মাঝে সম্রাট আকবরের দ্বীনে ইলাহীর দর্শন থেকে সৃজিত বাংলা বর্ষের সৃজন অন্যতম। কারণ এ ধরনের একটি বর্ষ প্রবর্তনের জন্য হিজরীসনের সম্পর্কিত মুসলিম সংস্কৃতির উত্থান বাধাগ্রস্থ হয়েছে, যার প্রভাব বাংলার মুসলমানরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না। মোগল সম্রাটরা যদি ইসলামের বিধি বিধান দিয়ে ভারত শাসন করতে পারতো তাহলে ১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্তির কোন কারণই ঘটতো না। মোগল সম্রাটদের লজ্জাজনিত কর্মাদীর অপচয় বিলম্বিত এবং সর্বপরি ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত অপসংস্কৃতির উৎসবাদী পর্যায় ক্রমে রাষ্ট্র ধর্মের সংঘাত এনে দেয়। যার ফলে ১৯৪৭ সনে ধর্ম দর্শনের দুইটি হলেও উহা শেষ পর্যন্ত আজও ধর্মের অনুশাসনে চলছে না। বরং ধর্ম নিরপেক্ষতার দর্শন দিয়ে ধর্মহিনতার আধিক্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। যার কারণে উপমহাদেশের কোন একটি দেশেও শান্তি নেই বললেই চলে। আবারও বলছি বাংলা নববর্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মূল্যায়ন থাকলে এবং উহা তাদের উৎসবাদী হলেও হতে পারে–কিন্তু উহা আদৌ মুসলমানদের উৎযাপনের বা অনুকরণের বর্ষ নয়। এর বিষদ ব্যাখ্যা পরবর্তি আলোচনায় আসবে।

www.pathagar.com

ইংরেজি বর্ষ

এ পর্যায়ে আমরা ইংরেজি বর্ষে বা ইংরেজি নববর্ষের আয়োজনাদী আলোচনা করবো। এ সকল আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের জন্য সঠিক বর্ষের,সন্ধ্যান তুলে ধরা। ইতিপূর্বে হিন্দু শাস্ত্রমতে প্রবর্তিত বাংলা নববর্ষকে যে কারণে মুসলমানদের জন্য পালণীয় বা অনুকরণী নয় বলা হয়েছে। ঠিক ঐ একই কারণে ইংরেজি বর্ষ মাস এবং দিনক্ষণকেও মুসলমানদেরকে বর্জন করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টির পূর্বে ফেরেস্তাদের সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً -

অর্থ ঃ "আমি পৃথিবীতে এক খলিফা নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক" (২ ঃ ৩০) এবং সেমর্মে তিনি আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠালেন। সৃষ্টির এহেন আদি তথ্য ইংরেজি বর্ষের প্রবর্তক খৃষ্ট সমাজের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের আদি পুস্তকে উল্লেখিত আছে। ঐ আদি পুস্তকে চন্দ্র সূর্যের উদয় অস্তের প্রসংগেও বলা হয়েছে ঃ

"পরে ঈশ্বর কহিলেন রাত্রি হতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশ মণ্ডলের বিতানে জ্যোতিপূর্ণ হউক, যে সমস্ত চিহ্নের জন্য ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক, এবং পৃথিবীতে দ্বীপ্তি দেবার জন্য দ্বীপ বলিয়া আকাশমন্ডলে বিতান থাকুক; তাহাতে সেইরূপ হইলো; ফলে ঈশ্ব দিনের উপর কর্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতি ও রাত্রীর উপরে কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষ ক্ষুদ্র এক জ্যোতি এই দুই বৃহৎ জ্যোতি এবং নক্ষত্রসমূহ নির্মাণ করিলেন (১-১৪-১৬ আদি পুস্তক)

উল্লেখিত শ্লেকে "ঋতুর জন্য দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক কথাগুলো স্পষ্টত" প্রমাণ করে যে চন্দ্র সূর্যের উদয়-অস্তের দিনক্ষণের নির্ধারনেই খৃষ্ট বর্ষের প্রবর্তন করা হয়েছে। উহাতে দিবস ও মাসগুলোর নামকরণ পুজ্য দেবতাদের সীমাকরণে হবার কারণে মুসলমানদের জন্য আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। হজরত ইসা (আঃ) একজন নবীও ছিলেন। খেলাফতী দায়ীত্বে তাকে যে আমানতদারী দেয়া হয়েছিল মুহাম্মদ (সা.) কে ঐ একই দায়ীত্ব দিয়ে নবী করা হয়েছিল। বরং হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে দ্বীনের দায়ীত্বের পূর্ণতা দিয়েই তাঁকে প্রেরণ করা হয়। সেক্ষেত্রে বর্ষ গণনার এহেন হিসেবেতো একটি ধারাবাহিকতার যোগসূত্র থাকার কথা। কিন্তু খৃষ্ট বর্ষ ইসা (আঃ)-কে দেয়ার দায়ীত্বের দর্শনে ঐ যোগসুত্রতার ছেদ হয়েছে। চন্দ্র সূর্য এবং তাদের উদয়-অস্তের

www.pathagar.com

নিয়মতান্ত্রিক ধারা আদম-হাওয়া সৃষ্টির বহু কোটি বছর আগ থেকেই চলে আসছে। খেলাফতি দায়ীত্বের স্বল্পতা ছিল কিন্তু চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্তের শল্পতা বা ভিন্নতা ও বিভ্রান্তিকর কিছু ছিল না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার খেলাফতী দায়ীত্ব পালনের সুবিদার্থে যে চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্তের সামঞ্জ্যতার দিক নিদের্শনা ঠিক করে দিলেন সেক্ষেত্রে ভিন্নতর খৃষ্টাব্দ খৃষ্ট বর্ষ এবং খৃষ্ট পঞ্জিকার প্রবর্তন শ্রষ্টার Chain of Command কে বিভ্রান্ত করে খেলাফতী দায়িত্বে নিয়োজিত মানব গোষ্ঠির মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছে।

হযরত ইসা (আঃ) ইন্তেকালের পরে খৃষ্ট বর্ষের খৃস্টাব্দের প্রচলন করা হয়। আর এহেন প্রচলনের মাধ্যমে তখন খৃস্ট সমাজের প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ অর্থাৎ হযরত ইসা (আঃ) অনুসারীরা শুধু ইসা (আঃ) নামকে Jesusই করে যাই। অধিকন্ত বর্ষটি নাম করনে খৃস্টাব্দ এবং দৈনন্দিন ব্যবসাহ-বাণিজ্যে এবং অন্যান্য কর্মদৌতে দিন ও মাসের যেসকল নামকরন করা হয়েছে উহার সবটাই মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাসের বিপরিত বিষয়। আজ সমগ্র ইউরুপ, আমেরীকার এবং বিশ্বে তাদের শাসিত উপনিবেশগুলোর মানুষদের সব কর্মেই ঐ ইংরেজি বর্ষের প্রভাব এবং প্রচলন অত্যান্ত বেশি। তাদের জীবনের আনন্দ-উৎসব এবং ধর্ম-কর্ম ঐ ইংরেজি বর্ষের দিনক্ষণেই পালিত হয়ে আসছে। উদাহরণ হিসেবে খৃস্টাব্দের রবিবারকে ধরা যেতে পারে। খৃস্ট সমাজ রবিবারকে তাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিবস হিসেবে পালন করেন। আর এ দিবসকেই আমাদের জুমা দিবসের মত বিশেষ প্রার্থনার দিবস হিসেবে মূল্যায়ন করেন। তারা গীর্জায় যান। রবি অর্থ সূর্য যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Sun. পুরাকালের গ্রীক সম্প্রদায় সূর্যকে তারা তাদের একটি দেবতা হিসেবে বিবেচনা করতো। আর সেই কারণে ঐ সৌরদিনটিকে দেবতার নাম করনে Sunday হিসেবে আখ্যায়ীত করেন। বৃটিশ শাসিত উপ-নিবেশগুলোতে Sunday-কে তাদের সাপ্তাহিক প্রার্থনার দিবস নামে তাদের অফিস-আদালত বন্ধ করে দিত। ১৯৪৭ সনে ইসলামের নামে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হলো, সেই পাকিস্তানে নীতি নির্ধারণে উপনৈবেসিক আনুগত্যের আরাধ্য বিষয়কে উপেক্ষা করতে না পারায় ঐ রবিবারকে তারাও সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে ব্যবহার করতো। পৃথিবীর বহু মুসলিম দেশ তাদের আন্তর্জাতিক লেন-দেনের অজুহাতে ঐ রবিবারকে তারা এখনও সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে অনুসরণ করে আসছে। আমাদের বাংলাদেশেও এরশাদ সরকারের আগেও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেবই রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতেই হউক রবিবারকে পরিবর্তন করে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে নির্ধারন করে বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধে বাধা একটি আয়াতকে বাস্তবায়ন করলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়ীক হবার ভয় তিনি শক্রদেবতার নাম পরিবর্তন করে ইওমে জুমা শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারেন নাই। কারণ সেক্ষেত্রে সাপ্তাহিক সব নামগুলোই

www.pathagar.com

আরবীতে সাজাতে হবে। ইওমে জুমার অনুবাদিক অর্থে শুক্রবার উহার সঠিক নাম নয়। কোরআনে একটি আয়াতের আমলের সুযোগ করে দেয়ায় মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধে ব্যাপক সাড়া জেগেছে। আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ ঃ হে সেই লোকেরা যারা ঈমান এনেছ, জুমার দিনে যখন নামাজের জন্য ঘোষণা (আজান) দেয়া হবে, তখন আল্লাহর স্মরণে দিকে দোড়াও এবং কেনা-বেচা পরিত্যাগ কর। ইহা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম–যদি তোমরা জান' (৬২ ঃ ৯)

এ আয়াতটি হিজরী বর্ষের আলোচনায় আসতো। কিন্তু প্রসঙ্গের প্রয়োজনে এবং পরিপুরক বিষয় বিধায় আয়তটিকে এখানে উদৃত করা হলো। যাতে প্রয়োজনের কারণটিকে অনুধাবন করা যায়।

সাপ্তাহের শুধু একটি দিনই নয়; বরং অন্যদিনগুলো এবং মাসগুলোকেও খৃষ্ট সমাজ কিভাবে নামকরণ করেছে উহারও কিছু আলোচনা থাকলে মুসলিম পাঠকরা অনুধাবন করতে পারবেন যে তারা কি ধরনের বিশ্বাসের মাঝে থেকে অনবরত শেরক করে চলছেন। Friday যাকে বাংলায় শুক্রবার বলে চালানো হচ্ছে–আসলে Friday অর্থ যেমন শুক্রবার নয়; তেমন কোন গ্রহ দেবতা নামেও Friday হয় নাই। আর খৃষ্ট সমাজে অথবা হিন্দু সমাজেও ধর্মীয় মূল্যবোধে তেমন কোন মূল্যায়ন নেই। অথচ মুসলমানদের কাছে Friday অথবা শুক্রবারের ধর্মীয় নাম ইওমে জুমার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। খৃষ্টাব্দবাদীরা এ Friday-র নামকরন করেছেন তাদের ফ্রিগ (Frigg) নামের এক গ্রীক দেবতার নামে। ঐ Frigg দেবতাকে খৃষ্ট সমাজ তাদের বিবাহএবং সন্তান উৎপাদনের সফল করন দেবতা হিসেবে পুজা করেন। মুসলমানরাও ইওমে জুম্মাকে বিবাহের দিবস মনে করলেও তারা কোন দেবতার দর্শনে দিবসটির পুজা করে না। খৃষ্ট সমাজ অন্যদিনগুলোর নামকরনেও তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর নাম ব্যবহার করেছেন। যেমন–Saturday রোমান দেবতা সেটানের নামে; Monday মুন (Moon) দেবতার নামে;Thursday ট্রাই (Try) দেবতার নামে; Wednesday উডেন দেবতার নামে; Thursday টিউটানিকে থান্ডার দেবতার নামে রাখা হয়েছে। ইসলামের মৌলিক বিষয় হলো কোন সৃষ্টিকেই দেবতা নামে উপসনা করা যাবে না। করলে উহাকেই শেরক বলা হবে।

সাপ্তাহিক দিনগুলোর সমন্বয় যে ইংরেজি বা খৃষ্টমাস ঐগুলোর নামও পুরাকালের গ্রীক দেব-দেবীদের নামকরনে রাখা হয়েছে। অথচ ইসা (আঃ)-এর ধর্মীয় দর্শনে ঐসকল নামকরন আদো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যেমন–January (জানুয়ারী) রোমান দেবতা জানুযের (Janus)-এর নামে। মার্চ (March) রোমের খৃষ্টের যুদ্ধের দেবতা Mars-এর

www.pathagar.com

নামে । তাকে রোমানরা তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে উপসনা করে। এপ্লোডাইট হলো গ্রীসের প্রেমের দেবতা। ঐ এপ্লোডাইট থেকে এপ্রিল (April) মাসের নাম করা হয়েছে। গ্রীকদের মায়া (Maya) দেবী নামে একটি পুজ্য দেবতা ছিল। ঐ মায়া থেকে May মাসের নামকরন করা হয়েছে। খৃস্টপূর্ব ৩০০ শত বছর পূর্বে খৃষ্ট সমাজে মায়া ধর্মের সংস্কৃতি গড়ে উঠে। মূলতঃ ঐ ধর্মের অনুসারীরা প্রকৃতি পুজায় নিজদেরকে উৎসর্গ করতো। গ্রীক রোমানদের Juno নামের একটি দেবতা ছিল। ঐ দেবতাকে Frigg দেবতার মত বিবাহের দেবী হিসেবে পুজা করা হতো। সেখান থেকে অর্থাৎ Juno থেকে June মাসের নামকরন করা হয়েছে। এ জুন দেবতাকে রোমানরা Jupiter-এর সমকক্ষ মেয়ে দেবতাদের প্রধান হিসেবে বিবেচনা করে। Juno এক সময় নারী সংক্রান্তের সমস্যার দেবতা হিসেবেও পুজ্য হতো।

ইংরেজি July মাসটির নামকরনে তেমন কোন প্রত্যক্ষ পুজ্য দেবতার নাম নেই সত্য। কিন্তু যার নামকে কেন্দ্র করে এর নামকরন হয়েছে কালের বিবর্তনে তখনকার সমাজের লোকেরা শক্তির পুজারী মনে করে তাকে পুজ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তিনি হলেন খৃস্টপূর্ব ৪৪ অব্দের রোমান সম্রাট Julius Cacsar. ফেব্রুয়ারী (February) ইংলিশ বছরের দ্বীতিয় মাস। ঐ মাসটি রোমানদের Februarius থেকে এসেছে এবং উহার Februa থেকেই মাসটির নামকরন করা হয়েছে। ঐ Februa রোমানদের একটি অঙ্গসুদ্ধিকরন অনুষ্ঠান যাহা এ মাসের ১৫ তারিখে পালিত হয়। December মাসটি খৃস্ট বর্ষের বারতম মাস এবং উহাই খৃস্ট বছরের শেষ মাস। নামটি কোন দেবতার নামকরণে না হলেও ইহা গ্রীসিয়ান ক্যালেন্ডারে (Greecian Calender)-এর ১২ মাস হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। ঐ December থেকে রাশিয়ায় Decembrist নামের একটি উচ্চ শ্রেণীর লোকদের নামকরণ করা হয়েছে। যারা সম্রাট Nepolian-এর সময় ফ্রান্স দখল করেছিল। Decembrist দের অধিকাংশই বড় বড় সেনা অফিসার। শব্দটি Latin decem থেকে Roman Republican Calender-এ এসেছে।

পাশ্চাত্যের খৃস্ট সমাজ হযরত ইসা (আঃ)-কে তাদের নবী মানলেও তাকে অনুকরণ করার ব্যাপারে তারা তেমন তৎপর নয়। তার অন্যতম প্রমাণ হলো হিজরী বর্ষকে উপেক্ষা করে মনগড়া দেবতাদের নামকরণে বর্ষ প্রবর্তন করন। ইদানিং তারা নববর্ষের নামে শুধু ১লা জানুয়ারীর দিনক্ষনকেই উৎযাপনের উৎস মনে করে না। অধিকন্তু তারা 31st December-কে অপসংস্কৃতির আধিক্য দিয়ে উহাকে রচম অশ্লিলতায় ভোগের মাতাম করে তুলেছে। সারা পৃথিবীর যুব শক্তি ঐ 31st night-এর অশ্লিল উৎসবাদী দিয়ে যে সংস্কৃতির আমদানী করা হয়েছে ধর্মপ্রাণ সমাজে উহার রফতানি করে সমগ্র মানব সভ্যতাকে চরম বিপর্যয়ের মাঝে ফেলে দিয়েছে। মুসলমানদের আল-কোরানের বিপরীত

www.pathagar.com

এহেন বর্বরতাকে অনুসরণ করতে গিয়ে এমন চরম পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, সেখান থেকে ফিরে এসে হিজরী সনের উৎস নবী মোহাম্মদ (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের তাৎপর্যকে তারা ভুলতে বসেছে এবং কিছুটা ভুলে গেছে। আমি ইতিপূর্বে সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কিছু কথা বলেছি। সেই সংজ্ঞায় সাজানো সংস্কৃতিই মুসলমানদের শক্তির সঞ্চারণ করতে পারে। কেননা এ ধরনের সংস্কৃতির সাথেই অহির সম্পর্কের আত্মার তথা আধ্যাত্মবাদের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়। উহা কিভাবে সম্ভব তার বিস্তারিত তথ্য হিজরী বর্ষের আলোচনায় আমি আনতে চেষ্টা করবো। তবে সে আলোচনায় পৌঁছার আগে আমরা আরও কয়েকটি বর্ষ কেন্দ্রিক আনন্দ উৎসবের দিনক্ষণের আলোচনা রাখতে চাই।

www.pathagar.com

হিজরী বর্ষ

আলোচ্য হিজরী বর্ষের আলোচনায় আমাদের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন— (ক) হিজরীবর্ষ গণনার ইতিহাস।

(খ) হিজরী শরীয়তের দৃষ্টিতে চন্দ্র ও সৌর হিসেবের গুরুত্ব।

(গ) হিজরী মাস এবং দিনক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত এবাদত।

(ক) ইসলামী জীবন ধারার নিয়ন্ত্রণের জন্য হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর মদিনায় হিজরতের কাল থেকে হিজরী বর্ষের প্রচলন হলেও মুলতঃ মোহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্বে মানব সৃষ্টির সূচনার আগে থেকেই একটি বর্ষের ১২টি মাসের উল্লেখে আল্লাহ তায়ালা আল-কোরানে অহি করেছেন। ঐ অহির আয়াতের আলোচনায় পরে আসবো। এর পূর্বে এখানে একটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানুষকে আল্লাহ পাক কোন ভৌগলিক সীমার সীমাবদ্ধ বিধি ব্যবস্থা দিয়ে সৃষ্টি করেন নাই। সমস্ত পৃথিবীর জন্য আল্লাহ আদম-হাওয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন। মহাকালের ক্ষুদ্রতম অংশের হিসেবে যুগে যুগে যে নবী-রসূলদের আল্লাহ পাঠিয়েছেন তারা কোন সংকির্ণ এবং ভৌগলিক সীমাবদ্ধতার বাণী নিয়ে আসেন নাই। বর্ষগননার যে চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্তের ধারাবাহিকতা উহাতে কোন ভৌগলিক সীমার জন্য নির্ধারণ করা হয় নাই। অথচ মানুষ কালের বিবর্তনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কারণ দিয়ে আল্লাহর অহির বিরুদ্ধাচরণে যে কাজগুলো করেছে তার মধ্যে জাতীয় এবং ভৌগলিক সীমার সীমিত সংস্কৃতির ভ্রান্ত ধারনা দিয়ে যে বর্ষদীর প্রচলন করেছে উহা ইসলাম অনুসারী মুসলমানদের জীবনে প্রযোজ্য হতে পারে না। তাই ইসলামের আল-কোরানে শেরক বহির্ভূত বিধানে যে আয়াত নাজিল হয়েছে উহার আলোকেই সমস্ত মানব গৌষ্ঠির জন্য যে ১২টি মাসের উল্লেখ উহাই হিজরী সনের স্থান করে নিয়েছে। মুসলমান হতে হলে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ঐ হিজরী সনের দিনক্ষণকেই অনুকরণ করতে হবে।

যে হিজরী সনকে আজ আমরা মুসলমানরা বর্ষ গননায় বিবেচনা করছি উহার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা যেতে পারে। আরবী চন্দ্র বছরের প্রথম মাস মহররম। কিন্তু ৬৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই বছরের কোন দিনপঞ্চি বা ক্যালেন্ডার ছিল না। চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভর করে গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নির্দেশে মুখে মুখে চন্দ্রমাস গননা করা হতো। রসূলে করীম (সঃ)-এর জামানায় বা পরবর্তিকালে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীকি (রাঃ)-এর জামানাতেও আরবে কোন সন বা অব্দ গননার প্রচলন ছিল না। তবে

www.pathagar.com

ঐ সময় ইহুদী এবং খৃষ্টানদের ক্যালেন্ডার ছিল। মুসলমানদের হিজরীসন গননা শুরু হয় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর বিন খাত্তাবের (রাঃ) আমল থেকে। এ গননার ছোট একটি পটভূমিকা রয়েছে। পাঠকদের সদয় অবগতির জন্য উহাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত ওমর (রাঃ) একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কায়েদ বা দুত পাঠিয়ে বার্তা আদান-পদান অপেক্ষা পত্র পাঠিয়ে প্রজাদের পত্রের মাধ্যমে বিষয়-বস্তুর সমাধান করতেন। তিনি সেই জামানার ইহুদী ও নাসারা ব্যক্তিবর্গের সাথেও পত্রালাপ করতেন। ইতিপুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্যকালে তাদের দিনপঞ্জির ব্যবহার থাকলেও আরবের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রেরিত পত্রে তারিখ লেখার প্রচলন ছিল না। হযরত ওমর (রাঃ)-এর এক পত্রের উত্তরে এক অমুসলমান পত্র প্রেরককে টিপ্পনী কাটেন যে, তাঁর (হযরত ওমরঃ) পত্রটি তারিখ বিহীন।

ঐ শূন্যতা সভ্য সমাজের জন্য অবশ্যই লজ্জাকর একটি বিষয়। তাই বিষয়টি হযরত ওমর (রাঃ)-কে দারুনভাবে আলোড়িত করে। তখন তিনি দেশের ঐ সময়কার গণিতজ্ঞ, জ্যোতিবিদ এবং পণ্ডিতবর্গকে নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, রাসুল করীম (সঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের তারিখ থেকে হিজরী সন প্রবর্তন করা হউক। কিন্তু তখন ছিল ৬৩৯ খৃষ্টাব্দ। এর সাত বছর পূর্বে ৬৩২ খৃষ্টাব্দে আমাদের প্রিয় রাসুল (সঃ)-এর ওফাত হয়। ওফাতের ১০ বছর পূর্বে ৬২২ খৃষ্টাব্দে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। সাখ্য প্রমানে পাওয়া যায় যে, রাসূল করীম (সঃ) পহেলা রবিউল আউয়াল মাসের এক সোমবার মক্কা থেকে মদীনায় গোপনে যাত্রা শুরু করেন এবং দুই শত মাইল পথ অতিক্রম করতে তাঁর ৮ দিন সময় অতিবাহিত হয়। পরের সোমবার অর্থাৎ আটই রবিউল আউয়াল তিনি মদীনায় উপস্থিত হন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হুজুর (সঃ) জীবনে সোমবারটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। কারণ তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরত করেন সোমবার; তিনি নবুয়ত পাপ্ত হন সোমবার এবং তাঁর ওফাতও হয় সোমবার। নবী করীম (সঃ) ৬২২ খৃষ্টাব্দে ৮ই রবিউল আউয়াল সোমবার মদীনায় পৌঁছেন। কিন্তু কোন মাসের আট তারিখকে বছরের পথম দিন ধরা যায় না। পহেলা মুহররম থেকে আটই রবিউল আউয়াল তারিখ পর্যন্ত ৬৭ (সাতষট্টি) দিন হয়। যদি এ সাতষস্টি দিন পিছিয়ে দেয়া হয় তাহলেই ১লা মুহররমকে হিজরী সনের নববর্ষে হিসাবে ধরা যায় এবং উহাই হিজরী সনের ১লা দিন হিসেবে মূল্যায়ন পেল। তবে সঠিক হিজরতের তারিখ প্রথম হিজরীর প্রথম মাসের পহেলা তারিখের পার্থক্য থেকে যায় ঐ সাতষট্টি দিন। পণ্ডিতগণ উহাকেই গ্রহণ করে নেন। World Book International এর মতে পহেলা হিজরীর ১লা মুহররম মুতাবেক ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই ছিল জুমাবার। হযরত আদম (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত অর্থাৎ হুজুর (সাঃ)-এর আগমনের আগ

www.pathagar.com

পর্যন্ত হিজরী নামে না হলেও চন্দ্রের উদয় অস্তের ১২ মাসকে তারা তাদের দিনক্ষনের বিবেচনায় উপেক্ষা করতে পারে নাই। আল্লাহ পাক তার শেষ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের বিবেচনা করে সুরা তওবায় বলে দিলেন ঃ

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ـ

অর্থঃ প্রকৃত কথা এই যে, যখন হতে আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন, তখন হতেই মাসগুলোর সংখ্যা মাত্র বার (১২) উহার মাঝে চারটি মাস হারাম (ওতবা-৩৬)।

আয়াতে উদৃত চার হারাম মাস বলতে বোজানো হয়েছে হজ্বের জন্য যিলকদ ঝিলহজ্জ, মুহররম এবং ওমরাহ এর জন্য রজব আয়াত প্রসঙ্গে তফছির কারকদের কিছু ব্যাখ্যাও পাঠকদের জন্য তুলে ধরা যেতে পারে।

আয়াতে এসেছে إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَاللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ـ (অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মাস গননার সংখ্যা হলো বারটি)। এখানে উল্লেখিত عِدَّتَ অর্থ গননা شُهُوْر হলো شَهْرٌ এর বহুবচন অর্থাৎ মাস। বাক্যের সারমর্ম হলো আল্লাহ পাকের কাছে মাসের সংখ্যাটি বারোতে নির্ধারীত এবং এতে কমবেশী করা যাবে না। ইসলাম যেহেতু প্রকৃতির ধর্ম, তাই অন্য বর্ষগুলো প্রকৃতির এ মৌলিক বার থেকে তের করে কোন বছর নির্ধারণ করতে পারে নাই। অতঃপর আয়াতে فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ বলে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, বিষয়টি " রোজে আমল" অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিনেই "লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এরপর আয়াতে يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ـ বলে ইঙ্গীত করা হয়েছে যে, রোজ আমলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারিত হয় আসমান ও জমিনের পরবর্তি মুহূর্তে। তারপর বলা হয় مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ـ অর্থাৎ তন্মধ্যে চার মাস হলো নিষিদ্ধ। যেহেতু এ চার মাস যুদ্ধ বিগ্রহ ও রক্তপাত হারাম। তাই এ চারটি মাস অত্যান্ত সম্মানী এবং অতীব বরকতময়। তাই এ মাসগুলোকে এবাদতের তথা পুন্যের মাস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পাঠকগণ সৃষ্টির প্রকৃতিক নিয়মে যে মানুষকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করলেন, তাদের দিনক্ষণ, মাস, বছরের জন্য হিজরী ছাড়া অন্যভাবে অন্যকোন বর্ষের বিবেচনা কি করে আসতে পারে? লওতে মাহফুজের রুহ থেকে যে মানুষের বর্ষ বিবেচনা রয়েছে, সেখানে একাধিক অন্য বর্ষের অবস্থান বিবেচনা করার সুযোগ কোথায়? আবার উহাও শেরকী দর্শনে দেবতা গণ্যে এবং অপসংস্কৃতির আধিক্যে আল্লাহ বিমুখী আচরণে। সুতরাং কোরআনের ঐ ইঙ্গীত কি প্রমান করে না যে, হিজরী বর্ষই মুসলমানদের বর্ষ?

www.pathagar.com

বিদায় হজ্জের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খোদবায় নবী করীম (সঃ) সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন ঃ "তিনটি মাস হলো ধারাবাহিক-ঝিলকদ, ঝিলহজ্জ ও মহররম এবং অপরটি হলো রজব"। আর রজব সম্পর্কে আরব বাসীদের দ্বীমত রয়েছে। কতিপয় গোত্রের মতে রজব হলো রমজান মাস। তার গোত্রের ধারণা মতে রজব হলো জমাদিউসসানী ও সাবানের মধ্যবর্তী মাসটি। এহেন বিভিন্ন মতের জন্য নবী করীম (সঃ) তাঁর খুদবায় খুমার গোত্রের রজব মাস বলার বিষয়টি পরীক্ষার করে নেন। পরের আয়াতের ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ অর্থ ঃ "এটাই হলো সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। অর্থাৎ ঐ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারন এ সম্মানিত মাসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত আহকামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের এলাহী নিয়মের সাথে সংগতিশীল রাখাই হলো "দ্বীনে মুসতাকীম"। এতে কোন মানুষের কমবেশী কিংবা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার কোন সুযোগ নেই। পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ অর্থ ঃ "সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোতে নিজেদের পতি অবিচার করো না।" অর্থাৎ এ পবিত্র মাসগুলোর যথাযথ আদব রক্ষা না করে এবং এবাদত বন্দেগীতে অলস থেকে নিজেদের ক্ষতি করো না।

ইমাম জাসসাস (রাঃ) আহকামুল কোরআন গ্রন্থে বলেন যে, কোরানের এ বাক্য থেকে ইঙ্গীত পাওয়া যায় যে, ঐ মাসগুলোর এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে এতে এবাদত করা হলে বাকি মাসগুলোতেও এবাদতের তওফীক ও সাহস লাভ করা যায়। অনুরূপ কেউ এ মাসগুলোতে পাপাচার থেকে নিজকে দূরে রাখতে পারলে বছরের বাকি মাসগুলোতেও পাপাচার থেকে দূরে থাকা সহজ হয়। ইসলামের হিজরীর মাসগুলো যে চন্দ্রের উদয় অস্তের উপর নির্ভরশীল একথা সূরা বাকারার ১৮৯ আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ط قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ـ

অর্থঃ "লোকেরা তোমার কাছে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, ইহা জনগণের সময় তারিখ নির্ধারণের ও হজ্জের নিদর্শন স্বরূপ (২ ঃ ১৮)।" উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) "আহিল্লাহ" বা নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ চাঁদের আকৃতি-প্রকৃতি সূর্য্য থেকে ভিন্নতর। চাঁদ এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকৃতি। অবশেষে সম্পূর্ণ গোলাকার হয়ে যায় এবং পূণরায় ক্রমন্বয় হ্রাস প্রাপ্ত হতে থাকে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ অথবা এর অন্তর্নির্হিত উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তারা প্রশ্ন করেছিলো। এই দুই প্রকার প্রশ্নেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে তাতে এর অন্তরনিহিত উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। যদি প্রশ্নই হয়ে থাকে যে, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে এ

www.pathagar.com

হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তরনিহিত রহস্য জানবার উদ্দেশ্য থেকে থাকে, যা ছিল সাহাবা কেরামদের স্বভাব বিরুদ্ধ। তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মৌল তত্ত্ব বর্ণনার পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনার দারা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গীত করা হয়েছে যে, আকাশ, গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমন্ডলীর মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। আর মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কোন বিষয়ই এই জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল না হলেও এর থেকে আসা মানব কল্যাণের জীবন জীবিকার বহুবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির বিবেচনা করেছে। কাজেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির আল্লাহই ভাল জানেন। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা ও জবাব এই যে, চাঁদের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উদয় অস্তের মাঝে আমাদের কোন মঙ্গল নিহিত তা বুঝাবার জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রশ্নে উত্তরে হুজুর (সঃ)-কে অহির মাধ্যমে বলে দিয়েছিলেন যে, আপনি তাদের বলে দিন, চাঁদের সম্পর্কে তোমাদের যে মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত তা এই যে, এতে তোমাদের কাজকর্ম, রুজি-রোজগার ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারন এবং হজ্বের দিনগুলোর হিসাব জেনে রাখা সহজতর হবে। চন্দ্র-সূর্য্যের এহেন উদয়-অস্তের সাথে মহাকালের মাঝে ধরে রাখার যে ইতিহাস উহাতে মানুষের দেয়া আল্লাহর খেলাফতী দায়ীত্বের যথেষ্ট দিক নিদের্শনা রয়ে গেছে। সুরা আল-আসরে আল্লাহ পাক ঐ ইতিহাসের প্রতিই ইঙ্গীত করেছেন।

www.pathagar.com

ইরানীদের নওরোজ

নওরোজ অর্থ নতুন দিন। ইরান বর্তমান বিশ্বে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র। তারা তাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী শারিয়াকে প্রাধান্য দিয়েই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। কিন্তু সেই দেশেও বাংলা নববর্ষের মত নওরোজ নামে ইংরেজি ২১শে মার্চ থেকে সাপ্তাহ ব্যাপী নববর্ষের অনুষ্ঠানাদীর উৎযাপন করা হয়। ইহা বাংলা নববর্ষ থেকে কয়েক হাজারগুন প্রাচীন প্রথার উপর ভিত্তি করে দাড়িয়ে আছে। আলোচ্য পুস্তকের বিবেচ্য বিষয়ের জন্য ঐ নওরোজকেও আলোচনায় আনা হলো। যাতে পাঠকরা বিশেষ করে মুসলমানরা হিজরী সনের গুরুত্বটা অনুধাবন করতে পারেন।

নওরোজ ইরানীদের একটি জাতীয় উৎসব। ইরানীয়ানদের প্রাচীন সভ্যতার আদি ইতিহাস থেকে এ দিনটির উৎযাপন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। পারস্যের সভ্যতার ইতিহাস যত পুরানো, নওরোজ উৎসবের ইতিহাসও তত পুরানো। ইরানের হাজারো বছরের পুরানো ঐতিহ্যকে ইরানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উহাকে জাতীয় উৎসব পালন করে আসছে। বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসনকে প্রতিহত করনের প্রায়শে এবং দেশের অভ্যান্তরে চিরস্থায়ী শান্তি এবং উন্নয়নের ধারাকে ধরে রাখার জন্যই ঐ নওরোজের অনুষ্ঠানাদীর উৎযাপন হয়ে থাকে। ঐ দিন ইরানীদের জাতীয় ছুটির দিন হলেও ইরানীরা সঠিকভাবে জানে না যে, কোন দিন বা বছর থেকে নওরোজ জাতীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। কোন কোন ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন যে, কোন এক প্রকৃতিক পরিবর্তনের কারণে নওরোজের উৎপত্তি ঘটেছে। বাংলা নববর্ষ যেমন জাতীয় উৎসব-ধর্মীয় উৎসব নয়। তেমনি ইরানীরাও নওরোজকে জাতীয় উৎসবের দিন মনে করলেও কোন কোন দলে বা মতের লোকেরা দিনটি উৎযাপনকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিবস হিসেবেও মূল্যায়ন করেন।

Zoroastrians দের মতে ইরানের সৌর ক্যালেন্ডারের Farvardin মাসটি বছরের প্রথম মাস হিসেবে বিবেচিত। ইরানীরা ঐতিয্যগতভাবে ঐ Farvardin নামক মাসটির সংক্রান্তে এ ধরনের একটি বিশ্বাস তারা প্রতিপালন করে যে, Faravashis অর্থাৎ ঐশ্বরীক এক শক্তি এ মাসের শেষের দিকের ১০ দিনে বস্তুজগতে অবর্তিন হয়। তাই ইরানীরা তাদের পুর্বপুরুষদের আত্মাকে appease অর্থাৎ প্রশান্ত করার জন্য বছরের ঐ ১০টি দিনকে

www.pathagar.com

তারা সম্মান করেন। ইরানীরা তাদের ঐতিয্যগত প্রথার প্রচলন হিসেবে তারা বছরের শেষ বৃহস্পতিবারে তাদের পূর্বপুরুষদের কবরস্থা Cemcteries-কে প্রদর্শন করেন। একজন প্রাচিন ইরানীয়ান মৃত Dehkoda যিনি ঐ মাসের এক ব্যাপক ভোজানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন যাকে ইরানীরা Farvardegan অথবা Farvardyan বলতো এবং ঐ ভোজানুষ্ঠান ১০ দিন পর্যন্ত চলতো। ঐ Farvardcgan বছরের শেষে উৎযাপিত হতো এবং উহা মূলতঃ একটি শোক প্রকাশের অনুষ্ঠান (Mourning ceremorey) হিসেবে পালিত হতো। আমাদের দেশে যেমন ১লা বৈশাখে নুতন কিছু খাবার-দাবারের আয়াজন করা হয়; তেমনি ইরানের প্রথাগতভাবে প্রাচিনকাল থেকে Farvardin (২১শে মার্চ) মাসের প্রথম দিনে বিশেষ ধরনের খাবারের আয়োজন এবং পরিবেশন হতো। সাধারনের মাঝে কতদিন এ ভোজানুষ্ঠান চলতো তার উল্লেখ না থাকলেও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে এহেন ভোজ প্রায় মাসাধিকাল ধরে স্থায়ী হতো। নিঃসন্দেহে নওরোজ নববর্ষের প্রথম দিন হিসেবে ইরানীদের একটি জাতীয় উৎসব। কিন্তু এ সংক্রান্তে ব্যাপক কোন বিষয় Achacmenian শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত কিছু জানা নেই। Zorastrians ধর্মীয় পুস্তক Avesta-তেও ঐ নওরোজ সংক্রান্তের কোন উল্লেখ নেই। এ তথ্যও কোথায়ও খুজে পাওয়া যাবে না যে, ঐ নওরোজ উৎযাপন কিভাবে এবং কবে থেকে প্রাচীন পারস্যদের ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে একত্ব হয়ে গেছে। তবে পারস্যের Sassanid শতাব্দীর পুস্তকাদীতে ঐ নওরোজ সংক্রান্তে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায়।

কথিত Babylonian সভ্যতার যুগে Achaemenion সম্রাটরা নওরোজের উৎসব দিনে তারা তাদের রাজপ্রসাদের বারান্দায় রাজকীয় পোষাকাদীতে বসতো এবং তারা তাদের রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদেরকে সাক্ষাৎ দিতো এবং তাদের দুতদের মারফতে পাঠানো উপঢৌকনাদী গ্রহণ করতো। এ তথ্য সমর্থিত হচ্ছে Perepolis এবং Kemanshah এর খোদিত শিলালিপি (Inscriptions) থেকে। কথিত আছে যে, প্রতিবছর এ নওরোজ দিবসে Achaemenion রাজারা বিশেষ করে রাজা Dariush the great (খৃষ্টপূর্ব ৫২১-৪৮৬) ব্যবিলিয়ন শহরের রক্ষিত Ba al Mardock মন্দিরের মুক্তির প্রার্থনায় যেতো। Porathions এবং Sassnids সম্প্রদায়ের সম্রাটরাও নওরোজের নববর্ষকে বিশেষ অনুষ্ঠানাদীর মাধ্যমে উৎযাপন করতো। নওরোজের সকাল বেলায় সম্রাট Dariush যখন রাজ প্রসাদে এবং রাজ পোষাকে তার সভাকক্ষে প্রবেশ করতো, তখন দেশের প্রধান Moobed অর্থাৎ Zoroastrian পুরোহিত তার হাতে শর্নের পাত্র, আংটি, মুদ্রা, তলোয়ার, কালি ইত্যাদি নিয়ে সভাকক্ষে রাজার সামনে বিশেষ মন্ত্র পাঠে প্রার্থনা করতো।

নওরোজের উৎসবের দিনে উচ্চ পর্যায়ের রাজ কর্মচারীরা রাজার জন্য বিভিন্ন ধরনের

www.pathagar.com

উপঢৌকন নিয়ে আসেন এবং রাজাও রাজকর্মচারী ও সাধারণ দর্শকদের জন্য উপঢৌকন আদান-প্রদান করেন। নওরোজের ২৫ দিন পূর্বে রাজ দরবারের সামনে মাটির দ্বারা ১২টি খাম্বা তৈরী করা হয় এবং প্রতিটি খাম্বার উপরিভাগে ১২ ধরনের গাছের বীজ লাগানো হয়। নববর্ষের ৬ষ্ঠ দিনে পূর্বের আলোচিত ঐ খাম্বা থেকে সদ্য গজানো গাছ তুলে Court-এর মেজেতে Farvordin-এর ১৬ তারিখ পর্যন্ত ফেলে রাখা হয় এবং ঐ দিনটিকে বলা হয় মেহের দিবস (Mehr day) ইরানীরা বছরের শেষ Wednessday-তে আগুন জ্বালাবার একটি উৎসব করে। প্রাচীন পারস্যবাসিদের বিশ্বাস যে, আগুন জ্বালালে বাতাসের বিশুদ্ধতা আসে। অধিকন্তু নওরোজের দিনে সকাল-বেলায় প্রাচীন ইরানীরা একে অপরের প্রতি দোলখেলার মত রং পানি ছিটাতো। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পরে এ প্রথার পরিবর্তন ঘটিয়ে শুধু পানির স্থানে গোলাপ পানি ছিটাবার প্রথা প্রচলিত হয়ে আসছে।

নওরোজের উৎসবাদীর মধ্যে Farvardin 6 অর্থাৎ March 26 দিবসে পারস্যবাসীদের অনেকে প্রথাগতভাবে গোছল করেন এবং Legames নামক খাদ্য গ্রহণ করেন। যাকে দেশীয় ভাষায় Sabzeh বলা হয়। ইসলামের আবির্ভাবের কারণে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষীতে নওরোজ উৎসবাদীতে কিছু ভাটা পড়লে উম্মাইয়াদের শাসনামলে ঐ উৎসবের পুনজাগরণ ঘটে এ কারণে যাতে তারা প্রজাদের কাছ থেকে মূল্যবান উপঢৌকনাদী আদায় করতে পারে। প্রাচীন এশিয়ান পুস্তকাদীতে আরও একটি উৎসবের উল্লেখ আছে যাকে Mchregan বলে। মোগলদের আগমনের পুর্ব পর্যন্ত Samarid এবং Ghaznavide-দের শাসনামলেও নওরোজ উৎসবাদী পালিত হতো। প্রাচীন পারস্যদের মত এখন আর নওরোজেব গুরুত্ব না থাকলেও রাজদরবারে এর একটি গুরুত্ব ছিল। বিশেষ করে নাদের শাহার আকশাব যুদ্ধের সময়ও নওরোজ উৎযাপন করতেন।

বর্তমান ইরানে ইসলামের ঐতিয্যকে ধরে রেখে তারাও আজ নওরোজ উৎসব করে এবং উহা অত্যান্ত ঝাকঝমকের সাথেই করা হয়। নওরোজ দিনে ইরানীরা নওরোজ টেবিল" নামে একটি টেবিলে প্রথম অক্ষর "S" হতে হবে এমন ৭টা আইটেমের খাদ্য দিয়ে টেবিল সাজাতে হবে এবং টেবিলের চারিপাশে নতুন কাপড় পরে শিশুদের উপঢৌকনাদী দেয়া হয়। গোলাপ পানি ছিটায়, মিষ্টি খায় এবং Sizdah-be-dar পালন করে। ঐ দিন ইরানের মুসলমানরা পারস্যেদের প্রাচীন প্রথায় মোমবাতী জ্বালায় এবং সপ্তাদীর মধ্যে উহা পবিত্র কোরানের উপরে রেখে ঐশি কেতাবকে সম্মান প্রদর্শন করে। Moravej-ue-Zahab নামক কেতাবে বর্ণিত আছে যে, পারস্য সম্রাট Jamshid-এর রাজত্বকালে একবার ঐ দেশে প্রবল আকারে ঘুর্ণিবার্তা হয়েছিল যাহা প্রায় তিনবছর স্থায়ী ছিল। ঐ ঘূর্ণিবার্তা দেশের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু বসন্তকাল আসার সাথে সাথে

www.pathagar.com

ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ আস্তে আস্তে স্তীমিত হয়ে আসে। তখন লোকেরা তাদের বিভিন্ন আশ্রয়স্থল থেকে বেরীয়ে এসে নওরোজ উৎসব করে।

আবদুছ ছামাদ বিন আলী প্রথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, নওরোজের দিন পারস্য দেশ থেকে একবার হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর উদ্দেশ্যে একটি রূপার পাত্রে হালুয়া জাতের কিছু খাবার পাঠানো হয়েছিল। হুজুর (সঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এ খাবার কোথা থেকে এসেছে এবং কোন গোত্র থেকে পাঠানো হয়েছে? উত্তরে বলা হয়েছে যে, ইহা পারস্য দেশের নওরোজ উপলক্ষে পাঠানো উপঢৌকন। আল্লাহর রসুল (সঃ) আনন্দের সাথে পারস্যের পাঠানো খাবারগুলো তাঁর সংগীদের নিয়ে খেলেন এবং বললেন যে, আল্লাহ কতই না মেহেরবান যে তিনি মেঘকে পানি বর্ষাতে আদেশ দিলেন এবং তখন সমস্ত মৃত্যুকে জীবন্ত করলেন এবং তা থেকে প্রথাগতভাবে আসা নওরোজের দিবসে পানি ছিটাবার উৎসব প্রথায় রূপান্তর লাভ করে। খলিফা ওমর (রা.) শাসন আমলে খুজিস্তান প্রদেশের গর্ভানর হোরমেজান (Hormezan) ইমাম আলী (রা)-এর জন্য নওরোজ দিবসে নববর্ষের উপঢৌকন পাঠালে হযরত ইমাম আলী (রা) উপঢৌকনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁর অনুসারীরা তাকে বললেন যে, ইহা ইরানের নওরোজের পুরষ্কার। তখন আলী (রা) বললেন, তা হলে প্রতিদিনই নওরোজ হউক। কথিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত আলী (রাঃ) মনোনয়ন আশ্চার্য্য জনকভাবে ঐ নওরোজ দিবসেই অনুষ্ঠিত হয়। ইরানের একজন প্রখ্যাত কবি হাকিম ওমর খৈয়াম সাহেব বলতেন যে, যিনি নওরোজ উৎসবাদী পালন করবেন তিনি আগত সামনের বছরে আনন্দ উৎসবে থাকতে পারবেন। এ ধরনের কথা আমাদের বাংলা নববর্ষের বেলায়ও বলা হয়ে থাকে। Aryans-দের সাথে প্রযোজ্য নওরোজ সংক্রান্তে বহু কেচ্ছা ও কাহিনী রয়েছে। পারস্যবাসিরা এ দিবসকে অত্যান্ত পবিত্র ও গৌরবময় দিন মনে করে উহাকে আন্তরীকতার সাথে উৎযাপন করে। এ দিবসে পারস্যের কোন নিষ্ঠুর রাজাও রাজবন্ধি অথবা হাজতবাসী সাধারন কয়েদীদের সাধারণ ক্ষমার মুক্তি দিতে দ্বীধাবোধ করতেন না।

ইরানীদের মতে নওরোজ পারস্যবাসিদের ঐক্যের উপহার। এবং ঐতিহ্যগত অতিতের সাথে বর্তমান প্রজন্মের যোগসূত্র সৃষ্টিকারী একটি উৎসব। প্রাচীন পারস্যের বিচক্ষণ এবং তখনকার Zorastran পার্দীগণ এ দিবসকে অত্যান্ত গুরুত্বসহকারে পালন করতেন। তখনকার দিনের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ মনে করতেন যে নওরোজ হলো বিশ্বভ্রমন্ড সৃষ্টির প্রথম দিন। তাদের মতে প্রাচীন পারস্যের ঈশ্বর Ahura Mazad বিশ্বভ্রমণ্ডের সৃষ্টির কর্ম ৬ষ্ঠ দিবসে শেষ করেন এবং এ কারণেই Farvardin মাসের প্রথম দিনকে Hourmazd এবং ৬ষ্ঠ দিবসকে Holy day হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাদের

www.pathagar.com

মতে নওরোজ যেহেতু বসন্তের শুরু হয়, তাই নওরোজের দিবসটি নতুন করে সৃষ্টিকে স্মরণ করায়। তাদের বিশ্বাস ঈশ্বর যে দিনটিতে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি করেন উহা নিঃসন্দেহে নওরোজের দিন। কারণ বসন্তই সৃষ্টির দর্শন। ইসলামের আবির্ভাবের পরে নওরোজকে পালনের পদ্ধতিতে ইরানীরা কিছু পরিবর্তন আনলেও এখনও দিনটিকে তারা অতি উৎসাহেই উৎযাপন করে থাকেন।

ইতিপূর্বেকার আলোচ্য নওরোজ যতই গৌরবময় উৎসব হউক না কেন উহাতে আল-কোরানীক দর্শনের প্রতিফলন নেই। ঐতিহ্যগতভাবে পুরাতন প্রথাই পরবর্তিতে সংস্কার ও শেরক সৃষ্টি করে। যেমন বাংলা নববর্ষের সাথে মুসলমানদের আকিদা, বিশ্বাসের বিবেচনা নেই, তেমনি ইসলাম পূর্ব ইরানীদের নওরোজ উৎযাপনও তেমনি একটি অনুষ্ঠান মাত্র।

ইসলামপূর্ব ইরানীদের প্রাচীন অগ্নী পূজারীদের আগুনের দাহন দর্শন থেকে বসন্তের ব্যবহারিক বিষয়ের একটি মনগড়া দিবস, যাহা হিজরীর বছরের আধ্যাত্মিক আরাধনার সাথে আদৌ মিল নাই। (Ref : Echo of Islam, Mareh 1997 No. 153) ইসলামের আবির্ভাব ঘটে প্রথাগত পুরানো আকিদা বিশ্বাসকে শেরক মুক্ত করে মানুষকে আল্লাহ মুখি করা। প্রথার প্রাচীনত্ব সেখানে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন বাংলাদেশের নববর্ষ প্রথার প্রচলিত বিশ্বাসাদী বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে ক্রমাগতভাবে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

চীনের নববর্ষ

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের আঞ্চলিক এলাকায় নববর্ষ উৎযাপনের একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। এ ঐতিহ্য থেকে কোন মানুষই একেবারে মুক্ত নয়। তারা ঐ ঐতিহ্য উৎযাপনে তারা তাদের দেশজ সংস্কৃতির মূল্যায়ন করেই এহেন উৎযাপনের আয়োজনে নিবেদীত। আর ঐ ধরনের উৎযাপনে বিশেষ বিশেষ আন্দোৎসব এমনভাবে সমাগত হয়ে দাড়ায় যে ঐগুলো যেন না করলেই নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলোর একটি ধর্মীয় মূল্যায়ন পায়, যা মুসলমানদের আদৌ করণীয় নয়। পৃথিবীর একটি বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর দেশ চীনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তারাও সৌরজগতের চন্দ্র, সূর্যের উদয়-অস্তের দিনক্ষণ মাস, বছর গননার মাধ্যমে ধরে নিয়েছে। তারা তাদের চন্দ্র বর্ষের নববর্ষ হিসেবে ফেব্রুয়ারীর ৭ (সাত) তারিখ নির্ধারণ করেছেন। এ দিন শহরে, গ্রামে-গঞ্জে বর্ণাঢ্য ড্রাগন শোভাযাত্রা দিয়ে নববর্ষের সূচনা ঘটে। নববর্ষের ঐদিনে অফিস-আদালত সকল কর্মস্থল বন্ধ থাকে। নববর্ষের প্রধান বৈশিষ্ট এবং ঐতিহ্য হচ্ছে ঐদিন বাড়ীতে পরিবারের সকলেই একত্রিত হওয়া। বিষয়টি আমাদের মুসলমানদের ঈদের মত। ঐদিনে চীনের প্রায় ১০ কোটি লোক বিভিন্ন কর্মস্থল থেকে বাড়ী ফেরে নববর্ষের উৎসবে অশংগ্রহণ করার জন্যে। একই সময় ১০ কোটি লোক ট্রেনে, বাসে, লঞ্চে এবং প্লেনে বাড়ী ফিরছে–ব্যাপারটা কি ব্যাপক ও ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়। চীন দেশটি যদিও বাহ্যিকভাবে হিজরী সনের দীনক্ষণের ধারক। কিন্তু হিজরীর দর্শনের যে মুসলিম ঐতিয্যের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সেটা তাদের মধ্যে নেই। দেশটি একটি কমুনিষ্ট (Comnmist) দেশ। নাস্তিকতাবাদীতে তারা বিশ্বাসী, বস্তুকেন্দ্রিক ঐ নাস্তিকতার নিয়মেই তাদের নববর্ষের আয়োজন করে থাকেন। এমনি করে পৃথিবীর বহু দেশের নানা মানুষের নানা ধরনের নববর্ষের উৎযাপনের ঐতিহ্য তুলে ধরা যাবে। কিন্তু আমি এর সংখ্যাধিক্যে নয়; বরং উহার গুণগত ঐতিহ্যকে উত্থাপন করে ইসলামের সাথে ঐগুলোর বিরোধ বা পার্থক্যকেই তুলে ধরবো। কারণ এহেন বর্ষ বিভ্রাটের কারণে মুসলমানরা তারা তাদের অজ্ঞাতে তাদেরকে দেয়া যে খেলাফতী দায়ীত্ব ছিল উহা হতে তাদের পদস্খলন ঘটতে চলেছে। তারা যদি তাদের এহেন পদস্খলনের পরিনতি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়; তবে তাদেরকে অবশ্যই হিজরী বর্ষের প্রবর্তন এবং উহার আমলে আগ্রহী হতে হবে। এখন দেখা যাক সেই হিজরী বর্ষটি কি এবং কেন?

www.pathagar.com

শরীয়াতের দৃষ্টিতে চন্দ্র ও সৌর হিসাবের গুরুত্ব

এখন আমি শরীয়তের দৃষ্টিতে চন্দ্র ও সৌর হিসেবের গুরুত্ব পাঠকদের সামনে তুলে ধরবো এবং এতে পাঠকরাই বিবেচনা করতে পারবেন মুসলমান তথা মানব গোষ্ঠির জন্য নববর্ষ বা বর্ষ কোন্‌টি হওয়া বাঞ্চনীয় ও গ্রহণযোগ্যতা বেশী। আল-কোরানে সূরা ইউনুসের ৫নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ـ

অর্থ ঃ "তিনিই সূর্য্যকে উজ্জ্বল ভাস্বর বানিয়েছেন, চন্দ্রকে দিয়েছেন দ্বীপ্তি। এবং চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি লাভের এমন সব মনজিল ঠিক ঠিক ভাবে নির্ধারীত করে দিয়েছেন, যার ফলে তোমরা উহারই সাহায্যে বৎসর ও তারিখসমূহের হিসাব জেনে নেও (১০ ঃ ৫)" এ আয়াতদ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, বিভিন্ন পর্যায়ের এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে চন্দ্রের পরিক্রমনের উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা বর্ষ, মাস ও তারিখের হিসাব জানা যায়। কিন্তু সূরা আল-বনি ইসরাইলে বর্ষ ও মাস ও দিনক্ষণের হিসেব যে সূর্য্যের সাথেও সম্পৃক্ত সে কথাও আল্লাহ্ বলে দিলেন ঃ

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ

অর্থ ঃ "অতঃপর আমি রাত্রের চিহ্নকে তিরোহীত করে দিনের চিহ্নকে দর্শনযোগ্য করলাম, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের দান রুজি-রোজগারের অনুসন্ধ্যান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষপঞ্জি ও দিনক্ষণের হিসাব অবগত হতে পার।" (১৭ ঃ ১২)

ঐ আয়াতটি দারা যদিও প্রমাণিত হলো যে, বর্ষ, মাস ইত্যাদির হিসাব সূর্যের আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি দারাও নির্ণয় করা যায়। কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে আল-কোরান যে ভাষা প্রয়োগ করেছে, তাতে স্পষ্টভাবে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামী শরিয়াতে চন্দ্র মাসের হিসাবই নির্ধারীত বিষয়। রমজানের রোজা, হজ্জের মাস ও দিনসমূহ, মহররম, ঈদ, শবে বরাত, শবে-কদর ইত্যাদির সাথে যেসব বিধি-নিষেধ সম্পৃক্ত সেগুলো সবই রুবাইতে হেলাল বা নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল কেননা এই আয়াতে هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ

www.pathagar.com

والحج, বলে মানুষের হজ্জ ও সময় নির্ধারণের উপায় বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। যদিও এ হিসাব সূর্যের দারাও অবগত হওয়া যায়। তবুও ব্যবহারিক দিক দিয়ে আল্লাহর নিকট চন্দ্রমাসের হিসাবই নির্ভরযোগ্য।

ইসলামী শরিয়াত কর্তৃক চন্দ্র মাসের হিসেব গ্রহণের কারণ এই যে, উহাতে প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই আকাশে চাঁদ দেখে চন্দ্র মাসের হিসাব অবগত হতে পারে। পণ্ডিত, মুখ্য, গ্রামবাসী, মরুবাসী পার্বত্য উপজাতী, সভ্য ও অসভ্য নির্বিশেষে সবার জন্য চন্দ্র মাসের হিসেবে সহজতর কিন্তু সৌর মাস ও সৌরবৎসর চন্দ্র মাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ও ব্যতিক্রম। এর হিসেবে জ্যোতিরবীদদের ব্যবহার্য্য দুরবীন যন্ত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতী এবং ভৌগলিক, জ্যামিতিক ও জ্যোতিবিদ্যার সূত্র ও নীয়ম-কানুনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এই হিসেব প্রত্যেকর পক্ষে সহজে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এবাদত বেন্দগীর ক্ষেত্রে চন্দ্রমাসের হিসেবে বাধ্যতামূলক করা হলেও সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ঐ হিসেবেরই প্রধান্য দেয়া হয়েছে মোট কথা হলো চাঁদ ইসলামী এবাদতের অবলম্বন। চাঁদ এক হিসেবে ইসলামের প্রতিক বা "শে-আরে" ইসলাম। ইসলাম যদিও সৌরপঞ্জী ও সৌর হিসেবকে এই শর্তে নাযায়েজ বলেনি, তবুও এতটুকু সাবধান অবশ্যই করেছে যাতে সৌর হিসাবে প্রধান্য লাভ না করে, এবং তাতে লোকেরা চন্দ্রপঞ্জী ও চন্দ্রমাসের হিসাব ভূলে না যায়। অথচ আমরা মুসলমানরা বিশেষ করে বাংলাদেশী মুসলমানরা হিন্দু এবং খৃষ্ট ধর্মের দেব-দেবীদের নামরণে বাংলা নববর্ষ উৎযাপন করতে গিয়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই হিজরী সনের দিনক্ষণের কথা ভুলেই গেছেন। এহেন অবস্থা চলতে থাকলে ইসলামী মূল্যবোধে বাধা চন্দ্রমাসের সাথে যে এবাদতগুলো জড়িয়ে আছে উহা একদিন হারিয়ে যাবে।

সৌর বছরের সাথে চন্দ্র বছরের ১০-১১ দিন পার্থক্য থাকায় প্রাচীন আরবে এবং ভারতে প্রতি তিন বছর অন্তর ১টি মাসকে অতিরিক্ত মাস হিসেবে ধরে গননা থেকে বাদ দেবার রেওয়াজ চালু ছিল। আরবীতে এ ধরণের সংযোজন ও বিযোজনকে বলে নাসী প্রথা। অন্যদিকে ভারতীয় পদ্ধতিতে একে বলে "খলমাস"। আল্লাহ পাক এ ধরনের মনগড়া গননা পদ্ধতি বাতিল করে কালামে পাকে অহি করে বলে দিলেন ঃ

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ.

অর্থ ঃ "নাসি অর্থাৎ (হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম করন) তো কুফরীর উপরে আর একটি অতিরিক্ত কুফরীর কাজ, যা দ্বারা এই কাফের লোকদেরকে গোমরাহিতে নিমজ্জিত করা হয়। এক বছর একটি মাসকে হালাল করে নেয়। আবার

www.pathagar.com

কোন বছর উহাকেই হারাম বানিয়ে দেয়। যেন এভাবে আল্লাহর হারাম করা মাসগুলোর সংখ্যাং পুরো হয়; আর আল্লাহর হারাম করা মাসগুলোও হালাল হয়ে যায়"। (তওবা–৩৭)

পূর্বালোচিত নাসি প্রসঙ্গে কিছু আলোচনার উল্লেখ থাকলে পাঠকরা আলোচ্য বর্ষ বিভ্রাটের বিষয়গুলোর কুফল অনুধাবন করতে পারবেন। তফসিরে এসেছে যে আরবে নাসী দুই প্রকার ছিল। এক প্রকার হচ্ছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধ্বংশাত্তক কার্য্যকলাপ ও রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোন হারাম মাসকে হালাল গণ্য করা হতো। এবং তার পরিবর্তে কোন হালাল মাসকে হারাম করে নিয়ে মাসের সংখ্যা পুন করে দেয়া হতো। দ্বীতিয় প্রকার হচ্ছে চন্দ্র বছরকে সৌরবছরের অনুযায়ী করার জন তার মধ্যে তারা কাবিসা নামে একমাস বৃদ্ধি করতো যেন হজ্জ সকল সময় একই মৌসুমে পড়ে ও চন্দ বছরের অনুযায়ী হজ্জ সকল মৌসুমে অবর্তিত হতে থাকলে যে অসুবিধা ও কাঠিন্য ভোগ করতে হয় তা থেকে বাঁচতে পারা যায়। এভাবে ৩৩ (তেত্রিশ) বছর ধরে হজ্জ তার সঠিক সময় অনুষ্ঠিত হতে থাকতো এবং মাত্র ৩৪ তম বছরে একবার হজ্জ তার যথা নির্দিষ্ট সময় ৯-১০ মিঃ যিলহজ্জ তারিখে অনুষ্ঠিত হতো। নবী করীম (সঃ) যে বছর বিদায় হজ্জ আদায় করেছিলেন সেই বছর হজ্জ সঠিক তারিখে পড়েছিল এবং সেই সময় থেকেই "নাসী" প্রথা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়' পবিত্র কোরানে ১৪০০ শত বছর আগে খলমাস পদ্ধতি বাতিল করে যে সন সংস্কার শুরু করেছিল ভারতে সেই সংস্কারের প্রথম ডেউ লাগে সম্রাট আকবরের সময়। তিনি সন সংস্কারের সময় ঐ খলমাস বাদ দেয়ার কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন।

ভারতীয় শকাব্দেও ডঃ মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে সংস্কার কমিটি ১৯৫৩ সনে সন সংস্কার করে খলমাসকে বাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক যে চন্দ্র ভিত্তিক গণনা পদ্ধতিকেই সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য সাম্যভিত্তিক গণনার পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আল্লাহর আয়াতে করীমে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ ـ

অর্থ ঃ রমজান মাস, এ মাসে আমি কোরান নাজিল করেছি, যা মানুষের জন্য সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারামের পার্থক্যের পথ প্রদর্শক। (বাকারা–১৮৫)

বিভিন্ন চন্দ্র মাসের বিভিন্ন ফজিলতসমূহ ও উহার তারিখ সম্পর্কেও আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অসংখ্য রেওয়াযেত ও হাদিস রয়েছে যেগুলো আমি পরবর্তিতে আলোচনায় আনবো। কারণ চন্দ্রমাসের সাথে ইহকালিন ও সম্পৃক্ত এবাদতগুলোতে মানবকল্যাণের পরকালিন মুক্তির যে বিষয়াদী রয়েছে উহাকে বাদ দিয়ে বাংলা নববর্ষে আমল দিয়ে ঐ মুক্তি অর্জন করা যাবে না। আর চন্দ্রমাস যে, আল্লাহর প্রদত্ত ও নির্ধারিত গণনার মাস তারও অনেক প্রকৃতিক প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহর প্রদত্ত সকল বিষয়ই প্রকৃতির

www.pathagar.com

সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর এ জন্যই ইসলামকে ফিৎরাতের বা প্রকৃতির ধর্ম বলা হয়। প্রকৃতি এ চন্দ্রমাসের গণনার তালে দোলে। সমুদ্রের জোয়ার ভাটার সাথে রয়েছে চাদের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক। আর তাতে গড়ে ওঠে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। আমাবস্যা ও পুর্ণিমার সাথে মানবদেহের সন্ধি-প্রদাহের (বার্তা) সম্পর্কটি ভুক্তভূগী মাত্রই উপলব্ধি করে থাকেন।

মেয়েদের মানসিক স্তর এবং সন্তান ধারনের সময় কালের হিসাব ও চন্দ্রমাসের হিসেবেই গণনা করতে হয়। পাশচাত্যের যৌন বিজ্ঞানী মেরীস্টোপ, মার্শাল, সেলাইস, ফর্ডনট হাওলক, এলিস প্রমুখও তাদের অভিজ্ঞতা প্রকৃত সন্ধ্যানের মাঝে এটাই খুজে পেয়েছেন।

নারীর কামস্পৃহাও চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথেই সম্পৃক্ত। ইসলামের হীজরী সনের বৎসর, মাস, দিন, তিথি ইত্যাদির বৎসরীক কৌশল সম্পর্কে কোরান এবং হাদিসে যত উল্লেখ আছে, পৃথিবীর কথিত, অন্য ধর্মে তা নেই। যে বাংলা নববর্ষকে ফসলী মাস বলে আখ্যায়ীত করা হয়েছে, সেই ফসলের সম্পর্কেও চন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত

কিন্তু বৈশাখ মাসে না কোন ফসল ওঠে আর না কোন সরকারকে খাজনা পরিশোধ করতে হয়, বরং ১লা বৈশাখ যে সংস্কৃতি উৎপাদন করা হচ্ছে উহাতে good life load করার কোন কর্ষণ নেই।

(গ) ইস্‌লামের হিজরী সনের সাথে মাস ও দিনক্ষণের এবাদতের কি ধরনের যোগ সূত্র আছে এখন আমি ঐ আলোচনায় আসবো। ইতিপূর্বেকার আয়াতের আলোচনার প্রেক্ষীতে আসা তথ্যের বিবেচনায় হজরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত ১২ (বার) মাসকে হিজরী সনে কি নামে ব্যবহারীত হয়েছে উহার উল্লেখ করা যেতে পারে। মাসগুলোর নামগুলো নিম্নরূপ ঃ ১. মহরম ـ مُحَرَّم

২. ছফর ـ صَفَر

৩. রবীউল আউয়াল ـ رَبِيْعُ الْاَوَّل

৪. রবিউছ সানি ـ رَبِيْعُ الثَّانِىْ

৫. জমাদি-উল-উলা ـ جَمَادِىَ الْاَوَّل

৬. জমাদিউসানি ـ جَمَادِى الثَّانِىْ

৭. রজব ـ رَجَب

৮. শাবান ـ شَعْبَان

৯. রমজান ـ رَمَضَان

১০. শাওয়াল ـ شَوَّالٌ

১১. ঝিলকদ ـ ذُوالْقَعْدَه

১২. ঝিলহজ্জ ـ ذُو الْحَجَّة

www.pathagar.com

পূর্বাদৃত মাসগুলো দিনক্ষণে কি ধরনের এবাদতের দিক, নির্দেশনা রয়েছে সেই সংক্রান্তে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসের আলোচনা রাখবো, যাতে পাঠকরা বুজতে পারেন যে মুসলমানদের ইমান ও আকিদায় ঐ দিনক্ষণের যোগসূত্রতা কত গভীর। প্রথমে হিজরীসনের মহররম মাসের আলোচনায় আসবো। কারণ এটাই হিজরী নববর্ষের সূচনা করে।

মুহররম শব্দের অর্থ হলো সম্মানীয়। যে বিষয়, বস্তু এবং ব্যক্তি বিশেষকে আমরা সামাজিকভাবে ভাল এবং সন্মানীয় বিবেচনায় সামাজিক রীতি হিসেবে অগ্রে স্থান দেয়া হয় উহাই মূলতঃ সন্মানীয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতিপূর্বেকার আলোচিত বাংলা এবং ইংরেজী বর্ষ বা দিনক্ষণের মূলতঃ যেখানে দেব-দেবীর নামকরণে হয়েছে, সেখানে হিজরী সনের মাস বা দিনগুলোর নামকরণ গুণবাচক বিশেষণ দিয়ে হয়েছে। দেব-দেবীর বস্তু বিষয়ক বিশ্লেষণের অবস্থান জনিত কারণে উহাতে সংকির্ণতা এবং সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু ইসলামের হিজরী বছরের বা দিনের নামাকরণে সংকির্ণতার উদ্বে থেকে গুণবাচক বিশেষণ দিয়ে নামাকরণের কারণে উহা মহাকালের মানদন্ডে কালের উর্দ্ধে থেকে যায়। যেমন– আলোচ্য মহররম বা সম্মানীয় শব্দগুলো। এক্ষেত্রে সম্মানীয় কোন বিশেষ সময়ের অথবা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর বিবেচনায় হয় নাই। বরং সকল কালের সন্মানীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অধিকন্ত মহররম শব্দটি গুণবাচক হওয়াতে উহা আকার আকৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকছে অর্থাৎ সম্মানীয় বিষয়টা কোন কালের হিসেবে গ্রহণ করার উপায় নেই।

ইতিপূর্বে আল্লাহর আয়াতের উদৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, মাসের সংখ্যা বার। উহার মধ্যে চার মাস হারাম। অর্থাৎ, রজব, ঝিলকদ, ঝিলহজ্জ এবং মুহররম। এই চার মাসের ঝগড়া বিবাদ, যুদ্ধে-বিগ্রহ ইত্যাদি কাজ করা অবৈধ। মহররম চার মাসের মধ্যে একটি মাস এবং এই মাসের মধ্যেই আশুরা মহররম মাসের ১০ তারিখ হলো আশুরা। যে ব্যক্তি এ মাসে নফল এবাদত বন্দেগী করেন আল্লাহ পাক তাকে অগণিত নেক দান করেন। সনদ পরম্পরায় আবু নসব হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এরশাদ করেছেন মহররম মাসে যদি কোন ব্যক্তি রোজা রাখে তবে তার প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে ত্রিশ রোজার পুন্য লাভ করে। মায়মুন ইবনে যেহরান হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন এই বলে যে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি মহররম মাসে আশুরার দিবস থেকে দশটি রোজা রাখে তবে তাকে দশ হাজার ফেরেস্তাদের এবাদতের সমতুল্য পুণ্য দান করবেন। আর যদি শুধু আশুরার দিন রোজা রাখে তবে তাকে ১০ হাজার শহিদের পুন্য প্রদান করা হয়। তাছাড়া তাকে দশ হাজার হাজী এবং ওমরাহ কারীদের দেয়া নেকের

www.pathagar.com

সমান নেক প্রদান করা হয়। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিস থেকে জানা যায় যে, এই আশুরার দিনে আল্লাহ পাক আছমান সৃষ্টি করেছেন এবং এই দিনে পাহাড়, সাগর, লাওহে মাহফুজ, কলম সৃষ্টি করেছেন। হজরত আদম (আঃ) কেও আল্লাহ পাক এই আশুরার দিনেই সৃষ্টি করেছেন, এবং তাকে এই দিনেই বেহেস্তে স্থান দিয়েছিলেন। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) কেও এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই দিনে তিনি তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ)-কে কুরবানী করেন। আশুরার দিনেই ফেরাউন নীলনদে নিমজ্জিত হয়। হজরত আইয়ুব (আঃ) এই দিনে রোগ মুক্তি পন। আর এই দিনে আল্লাহ পাক হজরত আদম (আঃ) এর তওবা কবুল করেছিলেন, আশুরার দিনেই হজরত ইসা (আঃ) জন্ম হয় এবং এই দিনেই পৃথিবী ধ্বংশ হবে। এই দিন হজরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ পাক এই আশুরার দিনেই তাঁর আরশে সমাসীন হয়েছেন।

কোন ব্যক্তি আশুরার দিনে নেকামল করলে মৃত্যুরোগ ব্যতিত আর কোন রোগ তার দেহে থাকে না। এই দিনে চোখে সুরমা দিলে সারা বছর চোখ ভাল থাকে। এই দিনে কোন ব্যক্তি কোন রুগীর সেবযত্ম করলে, তবে সে যেন সমস্ত আদম সন্তানদের সেবাযত্ম করলো যে ব্যক্তি আশুরার দিন প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহার পর পঞ্চাসবার সুরা এখলাস পাঠ করে চারি রাকাত নামাজ আদায় করে তবে উহার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তার পঞ্চাস বৎসর পূর্বের ও পঞ্চাস বছর পরের গুণাহ মাফ করে দেন এবং ফেরেস্তা সম্প্রদায়ের মধ্যে তার জন্য নূরের পঞ্চাসটি মহল তৈরী করে দেন।

হজরত আলী (রাঃ) বলেন, যে হজরত (সাঃ) এরশাদ করেছেন, মুহররম আল্লাহর মাস এই মাসে আল্লাহ তায়ালা একটি সমপ্রদায়ের তওবা কবুল করেছেন, যে ব্যক্তি এ মাসে তওবা করে আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করেন। এ মাসে আরও বহু এবাদতের কথা হুজুর পাকের হাদিস থেকে জানা যায়, এ সকল এবাদতের মাধ্যমে যে ব্যক্তি মুত্তাকী হতে পারে আল্লাহর কাছে তিনিই সম্মানীয় ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণযোগতা পায়। মূলতঃ মানুষকে সম্মানীয় করার জন্যই এ মাস যা ইতিপূর্বে নবী রছুলদের আমরা দেখতে পেয়েছি। তাছাড়া মুসলমানদের জন্য কারবালার মাঠে সর্বশেষ যে শিক্ষা রেখে গেছেন উহাও এই আশুরা এবং মহররম মাস। হজরত ইমাম হোসেন (রাঃ) কারবালার মাঠে ইয়াজিদের সন্যদের হাতে শহীদ হয়ে মুসলিম উম্মার জাগরণের যে ঐতিহাসিক বর্ণনার অবতারনা করে গেছেন, অনাগত সমস্ত মুসলমানদেরকে উহা থেকে শিখতে হবে। শহিদ হবার সঞ্জিবণী সাধ। হজরত ইমাম হোসেন (রাঃ) স্বীয় শাহাদত ও স্বজনদের কোরবানীর মাধ্যমে সকল যুগের, সকল প্রজন্মের সামনে, সকল যুদ্ধে সকল জিহাদে সকল রনাংগণে তথা দেশ কাল নির্বিশেষে সর্বত্র সর্বকালের মানুষের জন্য যে আদর্শ রেখে গেছেন উহাই মানবতার সনদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারবে। কারবালার এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হজরত জয়নব (আঃ) ইয়াজিদকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ

www.pathagar.com

"হে ইয়াজিদ। তুমি কি মনে কর যে, তোমার কাজের দ্বারা আমরা লাঞ্ছিত হয়েছি, এবং তুমি বিজয়ী হয়েছো? তুমি কি আল্লাহ তায়ালার এ বাণী ভূলে গেছ যে তিনি বলেছেন ঃ "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত্যু বলো না, বরং তারা জীবিত এবং রিযিক প্রাপ্ত।" তুমি মনে কর না যে, আল্লাহ তোমাকে যে সুযোগ দিয়েছে তা তোমার জন্য কল্যাণকর। এতে তোমার শুধু পাপই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জান্নাতের যুবকদের যিনি নেতা তাঁর দাঁতে লাঠির ধারা খোঁচা দিচ্ছো। তুমি নিশ্চিত জেনে রেখো যে, তোমাকে আল্লাহর বিচারের সম্মুখিন হতে হবে"

কারবালার মাঠে হজরত ইমাম হোসেন (রাঃ) এবং তার পরিবারের সদস্যরা রক্তের বিনীময় অনাগত মানুষের জন্য উদ্দিপক এবং প্রেরণাকর যে আমল রেখে গেছেন সেই রক্তের প্রশ্নে বাংলাদেশের ইরানী রাষ্ট দুতের স্ত্রী মিসেস ফাতেমা আভার সাজী বিগত ৪/৫/৯৮ ইং তারিখে "আশুরা আন্দোলনের বীরদের কৃতিত্ব ও ভূমিকা" শির্ষক এক সেমিনারে বলেছেন ঃ

"রক্তের যদি কোন বাণী না থাকে তাহলে ইতিহাসে শাহদতের অমর ঘটনা নির্বাক হয়ে থাকে। শহিদের রক্তের প্রবাহ যদি সকল প্রজন্মের জন্য কোন বানী রেখে না যায়, তাহলে ঘাতকরা যুগে যুগে আল্লাহর পথে সংগ্রামীদের নির্যাতন চালিয়ে যাবে। হজরত জয়নব (আঃ) যদি ইতিহাসের নিকট কারবালার বাণী বিবৃত না করতেন, তাহলে ইতিহাসে কারবালা থাকতো ঠিকই,– কিন্তু যে জনগণের এ বানী শোনা প্রয়োজন ছিল তারা তা শ্রবণ থেকে বঞ্চিত থাকতো। তাহলে যারা তাদের রক্ত দিয়ে অনাগত সকলপ্রজন্মের জন্য বানী রেখে গেছেন তাদের বানী কেউ শুনতে পেতো না। কারবালার আশুরার ঘটনার মাধ্যমে ইমাম হোসেন এক মোক্ষম কালেমা, শিক্ষা দিয়ে যান যা ইসলামী উম্মাহর সর্বকালের রক্ষাকবচ। আর এ কালেমাটি হলো ঃ

كُلَّ يَوْمٍ عَشُوْرَا وَ كُلَّ اَرْضٍ كَرْبَلَا ـ

অর্থঃ "প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণই আশুরা, সকল স্থানেই কারবালা"। অর্থাৎ কারবালার চেতনাই মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের একমাত্র চাবিকাঠি। সুতরাং মুসলিম এ চেতনাকে জাগ্রত রাখার জন্য ১০ই মহররমের আশুরাকে বাদ দিয়ে ইসলামের অন্য কোন দিন বা মাসকে যেমন– মূল্যায়ন করতে পারা যায় না, তেমনি ১০ই মহররমের আশুরাকে ইংরেজী অথবা বাংলা কোন মাসের বা দিনকালের সাথে সমন্বয় করার সুযোগ নেই। মহররম অর্থ যেমন সম্মানী তাই সন্মানী হবার দর্শন দিয়েই উহাকে বুজতে হবে।

হিজরী সনের দ্বিতীয় মাস হলো "ছফর (صَفَر) । মনে রাখতে হবে যে ইসলামের প্রতিটি এবাদত হিজরী সন ও মাসের সাথে সম্পর্কিত। আধ্যাতিক এবং ঐশী বহু অবদানে আল্লাহ মানুষকে পরকাল মুখী করতে চান। এ ছফর মাসে বহু নবী রছূল গণদের উপর

www.pathagar.com

নানা প্রকার বিপদ-মুসিবত এবং কাফেরদের অত্যাচার হতো। এ মাসে তাঁদের চেহারা মোবারক মলিন ও পান্ডুবর্ণ ধারন করতো বলে এ মাসের নাম হয়েছে ছফর (হলুদ)। কেতাবে আরও বর্ণিত আছে যে, ছফর মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার মাত্র প্রথম রাত্রে এক হাজার বালা-মুসিবত এ পৃথিবীতে অবর্তিন হয়। দ্বীতিয় রাত্রে দুইহাজার, তৃতীয় রাত্রে তিন হাজার, চতুর্থ রাত্রে চার হাজার; পঞ্চম রাত্রে পাঁচ হাজার এবং ষষ্ঠ রাত্রে ছয় হাজার রোগ-ব্যধি, বিপদ-আপদ বালামুসিবত পৃথিবীতে নেমে আসে (এরশাদুল তালেবীন)। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মোমেন বান্দাহদেরকে ইমানের পরীক্ষা এবং কাফেরদের ধ্বংশ ইত্যাদি কারণে এ বালামুসিবাত পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন। এ কারণে হাদিসে উল্লেখিত আছে যে এ ছফর মাসে অধিক সংখ্যক নফল এবাদত করতে হয় যাতে আল্লাহ মানুষের উপর থেকে বালামুছিবত তুলে নেন।

এ ছফর মাসের ২৭শে ছফর মুসলমানদের জন্য একটি খুসির দিন। যে দিনটিকে বলা হয় "আখেরী চাহার শোম্বা"। যাহা ছফর মাসের শেষ বুধবার হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এ ছফর মাসে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আবার এ মাসের শেষের বুধবার সকালে ঘুম থেকে জেগে তিনি বল্লেন ঃ "ওহে তোমরা কে আছ। আমার নিকট আস। এ কথা শোনামাত্রই উম্মোল মোমেনীন হজরত আয়শা (রাঃ) ছুটে আস্লেন এবং বল্লেনঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ। আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হউক আমি উপস্থিত আছি। তখন নবী করীম (সাঃ) বল্লেন ঃ "হে আয়শা! আমার মাথা ব্যথা দূর হয়ে গেছে। আমার শরীর বেশ হালকা মনে হচ্ছে। আমি আজ বেশ সুস্থ্য বোধ করছি" হুজুর পাক (সাঃ) এর এহেন সুস্থতা মোমেনদের জন্য যে আনন্দ বয়ে এনেছিল উহাকে অসুসরণ করার পদ্ধতি ছিল এ ছফর মাসের নফল নামাজ পড়া, বিশেষ করে ছফর মাসের শেষ বুধবার যাতে উম্মতে মোহাম্মদীরাও এ দিনের এবাদতের কারণে তাদের উপর আসা বালা মুছিবত থেকে তারাও পরিত্রাণ পায়। হিজরী সনের এ ছফর মাসটি ইংরেজী সনের April মাসের মধ্যে পড়ে। আমরা যদি হিজরীকে বাদ দিয়ে ইংরেজী বর্ষের অনুকরণ করি, তবে কি আমরা ইংরেজদের এপ্রোডাইট দেবতাদের অনুসারী হয়ে যাই না?

হিজরী সনের তৃতীয় মাসটির নাম রজব (رَجَب) ইহা হারাম মাসের মধ্যের একটি মাস। تَرْجِيْب শব্দ থেকে رَجَب শব্দের উৎপত্তি। তারজিব শব্দের অর্থ হলো কোন জিনিস তৈরী করা বা অগ্রসর হওয়া। হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) বলেন ঃ রজব মাসে শাওয়াল মাসের জন্য বহু পুন্য তৈরী করা হয় (গুনিয়াত তালেবীন), রবজ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার (يَوْمُ الْخَمِيْس) দিবাগত রাত্রকে লাইলাতুর বাগায়েব বলে।

এই রাত্রে মাগরিবের নামাজের পরে এবং এশার নামাজের আগে বার রাকাত নামাজ পড়ার ফজিলত আছে এবং নামাজ শেষে সত্তর বার নিম্নের দুরূদ পড়তে হবে।

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّى وَعَلٰى اٰلِهٖ

এই মাসের পনের তারিখটিকে শবে ইস্তেফতাহ বলা হয়। এই রাত্রে সত্বর রাকাত নফল নামাজ পড়া অথ্যন্ত পুন্যের কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই মাসের ২৭ (সাতাশে) তারিখের রাত্রকে "শবে মিরাজ" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।" কিতাবুল আওরাদে এই রাত্রে বার রাকাত নামাজের কথা উল্লেখ আছে। এ মাসের ২৭শে রজব রাতে হুজুর (ছঃ) আল্লাহর দ্বিদারে মেরাজে গিয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۔

অর্থ ঃ "পবিত্র তিনি, যিনি এক রাতে তাঁর বান্দাহকে মসজিদে হারাম থেকে দূরবর্তী সেই মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন যার চতুরদিকে তিনি বরকত দান করেছেন– যেন তাঁকে নিজের (আল্লাহর) কিছু নিদর্শনাবলী দেখাতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি সব দেখেন ও শোনেন" (সূরা বনি ইস্রাইল-১)

ঐ মিরাজের রাত্র ছাড়াও রজব মাসে আরও ৫টি রাত্র যাহা অত্যান্ত ফজিলতপূর্ণ রাত্র। উহা হলো ১লা, ১৫ই, ২৮ শে, ২৯ শে এবং ৩০ শের রাত্র সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন ঃ "হুজুর (ছঃ) বলেন, রজব মাসে একটি দিন ও একটি রাত্র আছে, ঐ দিন রোজা রাখলে ও ঐ রাত্রে এবাদত করলে একশত বছরের রোজা ও এবাদতের ছওয়াব লাভ করা হয়। ঐ দিন ও রত্রে হলো রজব মাসের ২৭ তারিখ। রজব হলো হিজরী সনের সপ্তম মাস। হিজরী সনের দিন, ক্ষণের সাথে মুসলমানদের এবাদতের যোগসূত্র এত বেশী যে, উহার কোন একটি বর্ষকে এবাদত নয় এমনটি বলা অবকাশ নেই। তবুও সৃষ্টির ফেতরাত এবং স্রষ্টার অভিপ্রায়ের আবরণে বিশেষ বিশেষ দিন সনের বিবেচনা আছে বিধায় আমিও এ আলোকে আরও কয়েকটি বিশেষ হিজরী মাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখবো। কারণ মুসলমানদের বর্ষ বিভ্রাট থেকে উওরন অবসম্ভবী না হলে আল্লাহর দেয়া আধ্যাতিক আবেদনে আরাধ্য কিছুই পাওয়া যাবে না। সেই লক্ষে আমি এখন হিজরী সনের শাবান মাসের (شعبان) আলোচনা রাখবো। সাবান অর্থ ------ হুজর (ছঃ) এ মাসে বেশী বেশী নফল রোজা এবং নামাজ পড়তেন। এ মাসটি রমজানের পুর্ব প্রস্তুতির মাস। এই সাবান মাসের ১৫ই সাবানকে শবে বরাত আখ্যায়ীত করে এদেশের মুসলমানরা যে সকল এবাদতের সংস্কৃতি চালু করেছে উহাও মুসলমানদের জন্য একটি বিভ্রান্তিকর পরিবেশ। রাত্রিটিকে শবে কদরের রাত্রের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত্রি হিসেবে বিবেচনা করে বেশ কিছু রুশম রেওয়াজের অবতারনায় এগুলোকে ইমানদারীর অংশ হিসেবে মূল্যায়ন করে ফেলেছে। অথচ আল-কোরান ঐ দিনের পালিত উৎসবাদীকে সমর্থন করে না।

সূরা দুখানের আয়াতকে অপব্যাখ্যা করে যে সকল আলেম সমাজ শবে বরাত নামের একটি রাত্রীর গুরুত্ব প্রকাশ করতে চান, পাঠকদের সুবিদার্থে ঐ আয়াতের উদৃতি নিম্নে

www.pathagar.com

তুলে ধরা হলো। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۔ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۔

অর্থ "শপথ এ সুস্পষ্ট প্রকাশকারী কিতাবের আমরা উহাকে এক বড় কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ রাত্রে নাযিল করেছি। কেননা আমরা লোকদেরকে সবধান করার ইচ্ছা করছিলাম" (৪৪ ঃ ২-৩)

ঐ আয়াতের তফসিরে থানভী (রাঃ) বলেছেন, অধিকাংশ তফসিরকারকগণ লাইলাতুল মুবারাককে শবে কদর বলে তফসির করেছেন। দ্বিতীয়ঃ তফসিরে মারেফুল কুরআন, যেখানে সংশ্লিষ্ট আয়াতের অর্থ করা হয়েছে। "শপথ সুস্পষ্ট কেতাবের আমি একে নাযিল করেছি এ বরকতময় রাত্রে। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাত্রে প্রত্যেক গুরুত্ব বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ অর্থের তাফসিরেও "লাইলাতুল মুবারাককে" তারা শবে কদর বুজিয়েছেন। এ রাত্রকে মোবারক বলার কারণ এই যে, এ রাত্রিতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অসংখ্যা কল্যাণ ও বরকত নাযিল হয়। অর্থের আলোচনায় একথাও বলা হয়েছে যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে শবে বরাত সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে এতে জন্ম মৃত্যুর সময় ও রিজিকের ফয়সালা লেখা হয়। এ থেকেই কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে বরকতের রাত্রির অর্থ নিয়েছেন শবে বরাত। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কেননা সর্বাগ্রে ২নং আয়াতে "শপথ সংশ্লিষ্ঠ কিতাবের' উল্লেখ থাকাতে বিষয়টি যে রমজানের শর্বে কদরের রাত্রকে বুঝানো হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ কোরান নামক কেতাবটি রমজান মাসেই নাযিল হয়েছে। আর শবে কদরের কথা আল-কোরানেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইহা সকল তফসিরকারই স্বীকার করেন শবে বরাত সম্পর্কিত উল্লেখিত কোন কোন রেওয়ায়েত কে ইবনে কাছির বলে সাব্যস্থ করেছেন এবং কাজি আবু বকর ইবনে আরবী সংশ্লিষ্ঠ বর্ণনা গুলো নির্ভর যোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনে আরবী শবে বরাতের ফযীলততো স্বীকারই করেন না। আল্লামা ইউছুফ আলী সাহেবের The Holy Quraan এর তাফসীরেও লাইলাতুল মুবারাককে কদরের রাত্রীকেই অর্থ করেছেন। তার ইংরেজী অনুবাদে তিনি লিখেছেন, "Usu ally taken to be the night in the month of Ramadan say the 21st 23rd 25th or 27th night of that month"

উপরে উদৃত আল-কোরআনের ঐগুলো অনুবাদের পরেও আমাদের দেশের দৈনিক ইন্‌কেলাবের শ্রদ্ধাভাজন আলেমগন সুরা দুখানের সংশ্লিষ্ট আয়াতের অপব্যাখ্যা দিয়ে "তরুণদের উৎসবের আনন্দের শবে বরাত" লিখে যে সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করতে চান উহা কি শবে কদরের রাত্রের গুরুত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে না? আমাদের শত্রুদের সরযন্ত্রে মৌলিক এবাদতের হাকিকতকে তুলে দিয়ে যেভাবে এবাদতের ফাজায়েলকে প্রতিষ্ঠার প্রায়শ নিয়েছে তাতো হয়তোবা একদিন শবে বরাতও লক্ষী পুজার পর্ব হিসেবে

www.pathagar.com

মূল্যায়ন হবে। লক্ষীর লীলা খেলায় যে সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে আজ যেন তারই প্রতিফলন গঠেছে, আমাদের শবে বরাতে তাইতো দেখি হিন্দু সমপ্রদায়ের নবান্নের মত আমাদের ঘরে ঘরে হালুয়ারুটি. ছেলে মেয়েদের অবাদ মেলা-মেশায় নতুন কাপড়-চোপড়ের হাট-বাজার, আত্সবারী ফুটানো; মেলা বসানো কতই না দেখ্ছি।

সাবান ছিল রজমান মাসের প্রস্তুতির পরিপুরক একটি মাস। অথচ বর্ষ বিভ্রাটের বিবেচনায় উহাও আজ উৎযাপনের দিন হিসেবে কতই না অগ্রসর হয়েছে। শরিয়ত সম্মত রাষ্ট্র না থাকার কারণেই এহেন উৎসবের উপস্থাপনা সম্ভব হয়েছে।

ঐ আলোচনায় আর না গিয়ে আমরা এখন ঐশী আদেশের সর্বাধীক গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস রমজান মাসের আলোচনায় আসবো। এই মাসের প্রত্যেকটি দিনই ছিয়াম (صِيَام) মুসলমানদের জন্য অবশ্যই পালনীয়। রমজানের সমস্ত মাসটিই একটি চন্দ্রমাসের সাথে সম্পর্কিত। এই রমজান মাসেই আল-কোরানের অহির ঐশী আদেশের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ـ

অর্থ ঃ "রমজান মাস, ইহাতে কোরান মজিদ নাযিল হয়েছে। তাহা গোঠা মানব জাতীর জন্য জীবন-যাপনের বিধান এবং তাহা এমন সুস্পষ্ট উপদেশ বলিতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক ও সত্যপথ প্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিস্কাররূপে তুলে ধরে"। (২ ঃ ১৮৫)

এই আয়াতটির মাঝে গোটা আল-কোরানই যে মানুষের জীবন, উহা স্পষ্টভাবে সত্যায়ীত হলো। আর ঐ মানব জীবনে সজ্জীবনের যে প্রায়শ উহা হতে পদস্খলনের স্বাভাবিক এবং তাকে এড়াবার লক্ষ্যে আল্লাহ পাক ছিয়ামের প্রশিক্ষণকে তাৎপর্যময় করার প্রয়োজনে ঐ একই সুরাতে বলে দিয়েছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে ইমানদারগণ। তোমাদের উপর রোজা ফরজ করে দেয়া হয়েছে। যেমন– তোমাদের পুর্ববত্তি নবীদের উম্মতদের উপর ফরজ করা হয়েছিল। ফলে আশা করা যায় যে, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হবে।: (২ ঃ ১৮৩)"

ঐ আয়াতে ইহাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রোজার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাক্ওয়া তথা সজ্জীবনের প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের যেমন পরীক্ষা আছে; তেমনি উহার পুরুস্কারের ওয়াদাও যে বিধি সম্মত একটি বিবেচনা আল্লাহ পাক ঐ প্রসংগেও অহি করে বলে দিলেন ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ

www.pathagar.com

أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۔ سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۔

অর্থ ঃ "আমরা ইহা (কুরআন) ক্বদরের রাত্রে নাযিল করেছি। তুমি কি জান ক্বদরের রাত্র কি? ক্বদরের রাত্রি হাজার মাস হতেও উত্তম। ফেরেস্তাও রুহ্ এ (রাত্রে) তাদের আল্লাহর অনুমতিক্রমে সব হুকুম লয়ে অবর্তিন হন। সেই রাত্রি পুরাপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার- ফজর উদয় হওয়া পর্য্যন্ত।" (সুরা-কদর)

এ রমজান মাসে পবিত্র কোরানকে ২০ রাকাত তারাবির নামাজের মধ্যে পাঠ করে উহার অন্তনিহিত বিষয়কে নামাজীদেরকে বোজাবার চেষ্টা করা হয়, যাতে নামাজীরা কোরানের আদেশ ও নিষেধাদীর বিষয়গুলো মানব কল্যানে, তথা সমগ্র মানব সৃষ্টির উদ্দেশের সাথে সমন্বয় করে পরকালের মুক্তির পথ খুজে নিতে পারে। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি একদিন রসুলুল্লাহ (ছঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসুলুল্লাহ (ছঃ) রমজানের অর্থ এবং উহার ফজিলত কি? তিনি জবাবে বল্লেন, রমজানকে তৌরাতে 'হাজ্ব', ইঞ্জিল, কেতাবে তার; যবুর কেতাবে কোরবাত এবং আল-কোরানে রমজান বলা হয়েছে। হাজ্বের অর্থ গুণাহকে নষ্ঠ করা; তার অর্থ কোন কিছুকে পবিত্র করা; আর কোরবাত অর্থ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা; রমজান শব্দটি 'রমজ' ধাতু হতে নিষ্পন্ন। আরবগণ ঐ বৃষ্টিকে রমজ বলে যে বৃষ্টি হেমন্ত কালে বর্ষিত হয়ে জমিনকে তরু-তাজা করে দেয়। এই মাসের শেষের ১০ দিনে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় রোজাদাররা ইতেক্বাফে মসজিদে অবস্থান করেন। ঐ ১০ দিনের এতেক্বাফে খুজতে হয় অত্যান্ত ফজিলতের লাইলাতুল ক্বদরের রাত্রিকে।

কারণ এই রাত্রে সমস্ত আগত মানুষদের ভাগ্যের লিখন অর্থাৎ সফলতা বা ব্যর্থতার বিষয় বিবেচনা করা হয়। এই রাত্রে আল-কোরানের সামগ্রীক শিক্ষার বাস্তবায়নের অংগীকার নিতে হয়। যাতে সত্য ও পূর্ণংগ জীবন বিধানের বিধি নিষেধ গুলো অনুকরণের মাধ্যমে আধ্যত্ববাদের চরম শিখরে আরোহণ করে আল্লাহর সন্তুষ্ঠি অর্জন করা যায়। এই রমজান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপয্যগুলো সমসাময়ীক ইংরেজি নভেম্বর অথবা বাংলার কার্তিক দিয়ে মুসলমানের জন্য অনুকরনযোগ্য হতে পারে না।

হিজরীসনের ১০ম মাস হলো শাওয়াল (شَوَّالُ) মাস। এই মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্যময় এবং সর্বপরি খুসি ও আনন্দের দিন হলো ১লা শাওয়াল যাকে মুসলিম বিশ্বে ইদুল-ফিতরের দিন হিসেবে আখ্যায়ীত করা হয়েছে। ঐ দিনের আনন্দ ও উৎসবক নওরোজ অথবা বাংলার নববর্ষ দিয়ে বুঝানো যাবে না। দিনটি স্বাগত জানানো হয় মিষ্টি বিতরনের মাধ্যমে। ঐ দিন সূর্যদয়ের পর থেকে দিপ্রহরের আগে ইদগাহ্ ময়দানে একমাস যাবৎ রমজানের শিক্ষার যে প্রশিক্ষণ ছিল উহার বাস্তবায়নের জন্য এবং শুকরীয়া

www.pathagar.com

হিসেবে এলাকার ধনী, গরীব, সাদা-কালো, রাজা-প্রজা কাঁধে-কাঁধ মিলীয়ে আল্লাহ পাকের সামনে দাড়ীয়ে দু রাকাত ওয়াজেব নামাজ আদায় করে এবং নামাজ শেষে পরস্পর পরস্পরকে আলিংগন করে সমর্থমত ভালভাল খাবার-দাবারের মাধ্যমে উম্মার ঐকের যে আদর্শ স্থাপন করা হয় উহা এত স্মরণী যে মুসলিম উম্মার ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে মজবুত করতে এর বিকল্প কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। অর্থনৈতিক ভাবে উম্মার আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইদুল-ফিতরের নামাযের আগে গরীবের ফেতরা প্রদান এবং নামাজ শেষে গরীবদেরকে সমর্থবানদের সম্মলিতভাবে যাকাত প্রদান উম্মার ভিত্তিকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে পারে, যদি সবগুলো তাক্ওয়া এবং আল্লাহ ভিত্তির আদলে আয়োজন করা হয়। আর ঐ সবকিছু নির্ভর করবে শাওয়ালের চন্দ্রের উদয়-উস্তের মাধ্যমে। যে চন্দ্রসূয্যকে ঐশী মাসের ঐতিয্যে জীবনের সামগ্রীক কাজে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে রেখেছে উহাকে অবহেলা করে মানুষ বিশেষ করে মুসলমানরা যখন মেকি আনন্দে আত্নহারা হতে চায়; তখন আল্লাহপাক কি আমাদের প্রতি খুসি থাকতে পারেন?

হিজরী সনের ১২তম মাস হলো 'ঝিলহজ্জ্ব' (ذِى الْحَجّه)

এই ঝিলহজ্জ্ব মাসের ৮ই থেকে ১২ ই ঝিলহজ্জ্ব মুসলিম বিশ্বের সমর্থবান মানুষদের জন্য অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যময় দিন।

মুসলিম বিশ্বের উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এর থেকে গ্রহণযোগ্য কোন বিধান আল্লাহ পাক মানুষকে দেন নাই। তাই হজ্জ কি; হজ্জ কেন? হজ্জের মৌলিক বিষয়ের (ক) নিয়ত (খ) এহরাম (গ) আরাফাতের মাঠে অবস্থান (ঘ) মুজদালেফায় রাত্রি যাপন (ঙ) মিনায় অবস্থান ও শয়তানের প্রতি কংকর নিক্ষেপ (চ) ক্বাবাঘর তাওয়াফ (ছ) হাজরে আছ্ওয়াদ পাথরে চুমো দেয়া (জ) ছাফা মারওয়া পাহাড় সাইকরণ (ঝ) পশু কোরবানী করণ (ঞ) মাথার চুল মুন্ডন এবং সর্বপরি যিয়ারতে মদিনা মোনোয়ারা ইত্যাদি বিষয়গুলোর তাৎপর্য্য ও হাকিকত বিষয়ক শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম উম্মার জন্য যে সংহতীর শক্তি নিহিত রয়েছে তাকে অনুধাবন করতে পারলে উম্মার ঐক্য অর্জন করা সম্ভব। আর পুর্বালোচিত প্রত্যেকটি বিষয়ের বিবেচনাতে চন্দ্র মাসের দিনক্ষণের যে সম্পৃক্ততা উহাতে যেমন ঐশী উপদেশে রয়েছে; তেমনি উপদেশের আমলের আধিক্য দিয়ে আধ্যত্ববাদের চরম সফলতায় আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করাও সম্ভব। আমার ইতিপূর্বের আলোচনায় ঐশী আদেশে চন্দ্রমাসের যে চারটি মাসের নির্দিষ্টতা ছিল উহার মধ্যে আমি রবীউল-আউয়াল (رَبِيعُ الْاَوَّل) বরিউছ সানি (رَبِيعُ الثَّانِى) জমাদি-উল-উলা (جَمَدِىُ الْاَوَّلَ) এবং ঝিলক্বদ (ذِى الْقَعْوَدُ) এ কয়টি মাসের ব্যাপক আলোচনায় যাইনী। কারণ বিশেষ দিনক্ষণের গুরুত্ব না থাকলেও রসুল (ছঃ) এর হাদিস থেকে বিশেষ বিশেষ দিনের নফল এবাদতের ফজিলতের কথা ঐ সকল মাসেও উল্লেখ আছে। আর মূলতঃ ঐ মাসগুলো আল্লাহ পাকের নির্দিষ্ট ঐশী

www.pathagar.com

আদেশের বাইরে নয়। তবে ঐ সবগুলোর ব্যাপক আলোচনাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু পাঠকদের বিভ্রান্ত বিষয়ক কিছু তথ্য তুলে দিয়ে একথা বুজাবার চেষ্টা করছি, যাতে মানুষ তার স্রষ্টার সংস্কারক বিষয়ের সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধশালী হতে পারে। কারণ হিজরী সনের আমলের মাঝে শেরক মিশ্রিত স্রষ্টার স্বীকৃতি নেই যা আমি খৃষ্ট বর্ষে এবং বাংলা বর্ষে আলোচনা করেছি।

ঐ লক্ষ্যে এখন আমি হিজরীসনের মাঝে অবস্থিত সপ্তাহের ৭ (সাত) টি নামের আলোচনা করবো। সপ্তাহের ঐ সাতটি নামও কোন দেব-দেবীর নামকরনে হয় নাই। বরং গনিতিক ও গুণবাচক বিশেষণে সর্বকালের সবমানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য কিছু নাম। যেমন ঃ

১. يَوْمُ الْاَحَد – প্রথম দিন
২. يَوْمُ الْاِثْنَيْن –দ্বিতীয় দিন
৩. يَوْمُ الثُّلَثَاء – তৃতীয় দিন
৪. يَوْمُ الْاَرْبَعَاء – চতুর্থ দিন
৫. يَوْمُ الْخَمِيْس – পঞ্চম দিন
৬. يَوْمُ الْجُمُعَة – ষষ্ঠ দিন
৭. يَوْمُ السَّبْت – সপ্তম দিন

কে বা কারা এবং কখন ঐ গণিতিক নামগুলোকে হিন্দু ধর্মীয় দর্শনের দৃষ্টিতে যথাক্রমে রবিবার, সোমবার, সঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার অনুবাদ করে নিলো উহা আমার জানা নেই। তারপর ঐ দেবতাগণের নামগুলোকে কারা আবার খৃষ্ট দেব-দেবী ইংরেজীতে Sunday, Monday, Twoesday, Wedness day, Thuresday, friday and Saterday তে অনুবাদ করে নিলো উহারও কোন তথ্য আমার কাছে নেই। তবে অনুবাদগুলো সুস্পষ্টই অসংগতী পূর্ণ এবং বিভ্রান্তীকর। কারণ যেখানে আরবী গাণিতিক শব্দ দিয়ে দিবস গুলোর নামকরণ হয়েছে সেখানে উহার অনুবাদে গণিতিক শব্দই ব্যবহার হওয়াটাই বাস্তব ছিল। কিন্তু সবটাই সত্যের বিপরিত শব্দে অনুবাদিত। যেমন– উদাহরণস্বরূপ . يَوْمُ الْجُمُعَة নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন মুসলমান কি করে হিন্দুদের শুক্রদেবতা এবং খৃষ্ঠবর্ষের গ্রীকদের frioo দেবতাদের নামের উচ্চারণে ঐ দিবসটির কায্যক্রমকে দিবসের নামে সাজাতে পারে? যেখানে শেরক মিশ্রিত সংস্কৃতি সংস্কারণে সপ্তাহের সাতটি দিনের নামকরণ হয়েছে, সেখানে একজন মুসলমানের পক্ষে এ নামগুলের উচ্চারণও শরীয়ত সম্মত নয়।

www.pathagar.com

প্রাচীন ইরাকের দজলা-ফুরাতের অববাহিকায় গড়ে ওঠা এ্যাসাইরিয়াম সভ্যতার নিকট থেকে হজরত ইয়াকুব (আঃ) এর বংশধরেরা সাতবারের নাম ব্যবহার করতে শিখে। তারপর খৃষ্টান সম্প্রদায় এদের নিকট থেকে এর ব্যবহার শুরু করে। পরবর্তিতে আমাদের প্রিয় নবী হজরত (মুহাম্মদ (ছঃ) পুর্বালোচিত আরবী নামগুলোই ব্যবহার করেছেন। অথচ আমাদের আলেম সমাজ এ সত্যটিকে সাধারণের কাছে তুলে ধরতে পারেন নাই। হুজুর (ছঃ) শুধু সপ্তাহের আরবী শব্দ গুলোই ব্যবহার করতেন না; অধিকন্ত হজরত আলী (কঃ) সম্বোধন করে বলেছিলেন–

"ওহে আলী! মহান আল্লাহ ৭দিনের মাঝে ৭টি কাজ নিহিত রেখেছেন– তা আমি ছাড়া আর কেউই জানে না। আমি তোমাকে সেই বিষয় বিশদভাবে শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি সেইভাবে কাজ করো"। সপ্তাহের ৭টি দিবসের কোন দিনে কি ধরনের কাজ করা উচিত যা নিম্নরূপ ঃ

১. ইয়াওমুল আহাদ = গৃহাদী পরিস্কার করা।
২. ইয়াওমুল ইছ্নাইন = বিদেশে যাত্রা করণ।
৩. ইয়াওমুল ছালাছা = খৌরিকর্ম করণ।
৪. ইয়াওমুল আরবা = ঔষধ খাওয়া অরম্ভ করা।
৫. ইয়াওমুল খামিছে = দোয়া কালাম বখ্সিয়া দেয়া।
৬. ইয়াওমুল জুম্য়া = বিবাহ করা।
৭. ইয়াওমুল সাবতি = শিকার করা।

(মোঃ আশরাফুল ইস্লাম সাহেব ধর্ম দর্শন বিষয়ক দৈনিক ইন্কেলাবের বিগত ২৩/৫/৯৬ তারিখের লেখা থেকে).

ঐ গণিতিক এবং গুণবাচক নামগুলোকে কোন ভৌগলিক সীমা রেখায় সীমাবদ্ধ করা যায় না। কারণ এক অথবা দুইয়ের গণিতিক কায্যক্রম শুদু আরবেই নয়; বরং পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল মানুষের ব্যবহারের বিষয়। উচ্চারণে আংশিক সীমাবদ্ধতা আছে; কিন্তু শেরকী সংস্কৃতিক ধারণার প্রতিফলন নেই।

অধিকন্ত সামগ্রীকভাবে আন্তর্জাতিক অবস্থানে সকলের জন্যই উচ্চারণ যোগ্য এবং অনুকরনীয় হতে পারে। আর দিনের এহেন নামাকরণে ইস্লামের বিধানের আর্ন্তজাতিক আবেদনের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তাছাড়া ইসলামের মৌলিকত্বে যে তৌহিদী বিষয় উহাও যে শিরক বর্জিত বিধান উহা এ ধরনের নামকরণ থেকেও বুজা যাবে; যা ইতিপূর্বে আমি খৃস্টবর্ষ এবং বাংলা বর্ষে আলোচনা করেছি। সপ্তাহের ৬ষ্ঠ দিবসকে ইওমে জুময়া বলা হলেও জুমার অন্য অর্থ হলো একত্রিত হওয়া। ইহা মূলতঃ জহুরের নামাজের মুস্লমানদের একত্রিত হওয়ার বিধান থেকেই আহরীত। কিন্তু জুমা শব্দের অনুবাদ করে উহাকে শুক্রবার অথবা ফ্রাইডে অর্থকরণ আদৌ সংগত নয়। ইসলামের

www.pathagar.com

আল-কোরআনের জুম্মা ছালাতের গুরুত্ব এত ব্যাপক যে আল্লাহ পাক জুম্মার উপরে একটি সূরাই নাজিল করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ হে সেই লোকেরা যারা ঈমান এনেছ জুমার দিনে যখন নামাজের ঘোষণা দেয়া হবে, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে দোড়াও এবং কেনা-বেচা পরিত্যাগ কর। ইহা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম। যদি তোমরা জান "(জুম্য়া-৯)

ঐ আয়াতের তাফছিরে মুসলমানদের বহু কল্যাণের কথা উল্লেখ আছে। মুসলমানদের সামাজিক, রাজনেতিক অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের কল্যাণ ব্যাপার নিয়ে মুসলমানদের জন্য জুমার নামাজকে ওয়াজেব করা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ বিষয়ের যে দর্শন উহাকে friday অথবা শুক্রবার নামকরণে নেহাত নৈতিক বোধকে কটাক্ষ করা হবে এবং শেরক করা হবে। যাহা ক্ষমার যোগ্য নয়। জুমার গুরুত্ব বুজাবার জন্য আমি ইওমে জুম্মা এবং সপ্তাহিক ছুটি নামের পুস্তকে জুমার দিনের উপর ব্যপক তথ্যের উপাস্থাপনা করেছি। মূল কথা হলো যে, ইস্লামের হিজরীসনের দিনক্ষনের সাথে শুধু মুসলমানদেরই নয়;

অধিকন্তু সমস্ত মানুষের ইহকালিন এবং পরকালিন মুক্তির যে দর্শন উহাকে অবজ্ঞা করা সানি সজ্জীবনের সংস্কৃতিকেই উপেক্ষা করা হবে। এবং উহাতে মানবতার কল্যাণ প্রকাশ পাবে না।

www.pathagar.com

শেষ কথা

আমি আমার প্রতিটি পুস্তকেই 'শেষ কথা' বলে একটি অধ্যায় রাখি। কারণ আলোচ্য বিষয় থেকে পাঠকদের হেদায়েত বা কিছুটা দিক নির্দেশনা দেয়া পুস্তক লেখার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। প্রতিটি পুস্তক কোন যা কোন জ্ঞানের কথা বলে। কিন্তু এ জ্ঞান জীবনের কর্মকান্ডে ব্যবহারিত না হলে জ্ঞান অর্জন করনের আদৌ কোন অর্থ হয় না। আমি যে জ্ঞানের কথা বলছি সে জ্ঞানও আমার নয়। আমি গাধার মতই আলোচ্য জ্ঞানের বোঝা বয়ে চলছি। শেখ সাদী বলেছেন ঃ

"জ্ঞানীজন সুধায় কেহ, জ্ঞান পেয়েছো কোথায় জ্ঞানী?
জ্ঞানী বলেন," বুজলে মিয়া বোকার কাছে জ্ঞানের খনি"।
গর্দভেরা বোঝা বহে চিনির বোঝা সে কি জানে?
জানলে কি আর বইতো গাধা, হতো সে রে মহাজ্ঞানী"।

পাঠকবৃন্দ! সেখ সাদীর এ তথ্য কথা থেকে বুঝে নেবেন জ্ঞানের মর্ম এবং জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য। হুজুর (সা.) বলেছেন ঃ যে বিদ্যা হতে কোনো উপকার হয় না উহা এমন ধনাগার যা হতে আল্লাহর পথে কোন হিতকর্মে প্রদান করা হয় না। আমার জ্ঞান মাধ্যমে আমি পাঠকদেরকে বিশেষ করে মুস্‌লমানদেরকে একথাই বুজারার চেষ্টা করেছি যে, তারা যেন হিজরী বর্ষকেই জীবনের কর্মকান্ডে প্রচলন ও প্রয়োগ করতে শিখে। কারণ ইমানদারদের জন্য শেরক একটি মস্তবড় পাপ, যা কোন অবস্থায় আল্লাহ পাক মাপ করতে চান না। নবী-রাসূলদের প্রতিযুগের আগমন ছিল মানুষকে শেরক থেকে উদ্ধার করে তৌহিদের একক সত্বা আল্লাহর এবাদতে পথনির্দেশ দেয়া। আল-কোরানেও ঐ একই নিদের্শ দিয়ে মহাম্মদ (ছঃ) কে পাঠানো হয়েছিল ঃ

আমাদের প্রতিও তাই কোরানের নির্দেশ ছিল ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۔

অর্থ ঃ "হে ইমানদার লোকেরা তোমরা পূর্ণরূপেই ইসলামের মধ্যে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন" (বাকারা-১০৮)

অথচ আমাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আলোচ্য সংস্কৃতির জীবনে ঐ আয়াতের প্রভাব এবং প্রয়োগ নেই বল্‌লেই চলে শয়তানের

www.pathagar.com

প্ররোচনায় শেরক মিশ্রিত ইংরেজী এবং বাংলা নববর্ষের দিন, ক্ষণ, মাস ও বছরের হিসেব দিয়ে যে অনুকরণ ও উচ্চরণে আমাদের কর্মজীবনকে সাজিয়ে চলছি উহা কি ইসলামের মধ্যে পূর্ণাঙ্গরূপে দাখিল হওয়া প্রমাণ করে? আমার জ্ঞানে উত্তর হলো করে না। বরং ইতি পূর্বেকার আলোচিত মহাকালের কর্মকাণ্ডে যে ভাবে আমরা প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছি, উহা আল্লাহ পাকের প্রবর্তিত বিধানকে লংঘন করেই আমরা হিজরী সনকে ও উপেক্ষা করছি। হিজরী সনের উপেক্ষণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের অনুকরণ নয়; বরং ইংরেজী ও বাংলা বর্ষের অনুকরণ দিয়ে মূলতঃ আমরা পরোক্ষভাবে শেরকী কর্মে জড়িয়ে পড়েছি।

আল্লাহ তায়ালা সূরা যুমারের ৬৫ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দিলেন ঃ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদেরকে একথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়ার প্রয়োজন হয়েছে কেননা তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বে গত হওয়া সমস্ত নবী রসূলদের প্রতি ওহি পাঠানো হয়েছে যে, তুমি যদি শেরক কর তা হলে তোমার আমল নষ্ঠ হয়ে যাবে। আর তুমি ক্ষতি গ্রস্ত হবে।" (৩৯ ঃ ৬৫)

শিরক হলো এমন একটি পাপ কর্ম যেখানে কোন মানুষ তার স্রষ্ঠা আল্লাহকে মানার পরে তার দৈনন্দিন কাজকর্মের সাথে অন্য কোন সৃষ্টিকে দেব-দেবী গণ্যে করে তাদেরকেও পুজা করে। ইতি পূর্বে আমার আলোচ্য বাংলা এবং ইংরেজী বর্ষের মাস ও দিনগুলোর নামের সাথে যে দেব-দেবীদের উল্লেখ ও উচ্চারণ আমাদের মুসলমানদের করতে হয় তাতে মুসলমানদের স্বকীয়তায় যে শিরকের প্রভাব পড়েছে উহা ইচ্ছাকৃত না হলেও, আমরা আমাদের অজ্ঞাতে এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারছি কি? সম্ভবত পারছি না। বরং নিজেদের আদল পরিবির্তন করে অপসংস্কৃতির আধিক্য দিয়ে অশ্লিল আনন্দে আমরা আত্মহারা হতে চেষ্টা করি। এ করাটা হিজরী সন দিয়েও করা যায় যদি নেহাত আনন্দই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু হিজরীসনকে বাদ দিয়ে মানুষের গড়া বর্ষাদির মাধ্যমে নেহাত একদিনের ১লা বৈশাখ অথবা ১লা জানুয়ারী দিয়ে সংস্কৃতির সামগ্রীক সত্য অনুধাবন করা যায় না। আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টির ধারাবাহিকতাকে সময়ের যোগসূত্রতায় পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টি করতে গিয়ে বলে দিলেন ঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ـ

অর্থ ঃ তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। পরে শুক্রকীট হতে, তারপর

www.pathagar.com

জমাটবাঁধা রক্ত হতে। তারপর তোমাদেরকে শিশুর আকার আকৃতিতে বের করেন। পরে তোমাদেরকে বুদ্ধি দান করেন। যেন তোমরা তোমাদের পূর্ণ শক্তি সামর্থ পর্যন্ত পৌঁছতে পার। পরে আরও বৃদ্ধি দেন যেন তোমরা বার্ধ্যক পর্যন্ত পৌঁছও। আর তোমাদের কাকেও বাধ্যকের পুর্বেও ডেকে পাঠানো হয়। এসব কিছু এজন্যে করা হয় যেন তোমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৌঁছে যাও। আর এজন্যে যে, তোমরা প্রকৃত ব্যাপারে অনুধাবন করতে পার" (সূরা আল মুমেন-৬৭)

ঐ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হলো সময়ের যোগসূত্রতাই সৃষ্টির দর্শন এবং উৎস। মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব এবং সন্তান ধারণের বিষয়টিও হিজরী মাসের দিনক্ষণের সাথেই সম্পৃক্ত। এহেন বাস্তবতাকে বাংলা অথবা ইংরেজী বছরের অনুসারীরাও অস্বীকার করতে পারে নাই। তবুও গ্রহ নক্ষত্রের নামকরণে জ্যোতিষীরা বাংলা বর্ষের মাস ও দিনক্ষণের সাথে যে মঙ্গল বা অমঙ্গলের বিবেচনা দিয়ে বিভিন্ন পুজাপর্বনের ব্যবহার দেখায় এবং যে দেবতাদের ভূমিকায় তাদেরকে নেয়া হয়, তাতে অমুসলমানদের সমাজে সেগুলো পুজার বিষয় হলেও মুসলমানদের জন্য উহা কুসংস্কার জনিত কারণে তাদেরকে তাদের আজ্ঞাতে শিরক ধরনের পাপেই ফেলে দিচ্ছে।

সম্রাট আক্‌বর লেখা পড়া জানতেন না। এটা তিনি নিজেও স্বীকার করে গেছেন। তিনি যে দ্বীনে এলাহী ধর্মের প্রবর্তন করেছেন উহা তার মোগল সম্রাজের প্রশাসনিক সুবিদার্থে এবং উহা সম্ভব হয়েছিল তার বিচক্ষণ কুবুদ্ধিদতাদের পরামর্শে। তিনি যদি হাদিস ও আল-কোরানের মর্মবাণীকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন তবে আজ সমগ্র ভারতেই একটি শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট থাক্‌তো। তাই রছুল (ছঃ) বলেছেন "তোমরা কি জান, কিসে ইস্‌লামের প্রাণশক্তি 'শুষিয়া বিনাশ করে?–উহা হলো বিদ্ধানের ভ্রম, কপটচারীর চক্রান্ত ও পথভ্রষ্ঠ নরপতির আদেশ"। মোগল সম্রাজ্যের ব্যাপারে পুর্বালোচিত হাদিসটি এতই সত্য যে আকবরের কথিত দ্বীনে এলাহীর Byproduct হিসেবই তিনি বাংলা নববর্ষের সূচনা করেছিলেন। শুধু বাংলা নববর্ষেরই সূচনা করেন নাই। বরং হিজরী সনকে বাদ দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ বাদের দর্শনের বীজ বপন করে গেছেন। রাজাবাদশাদের শাসনে সাধারণত ঃ খ্যায়াল ও ক্ষমতার খর গহস্থের প্রতিফলন ঘটে থাকে। মোগল রাজাবাদশাহদের বেলায়ও তাই ঘটেছে। তারা অনেকে প্রকৃত ওলিও ছিলেন। আবার কেউ সৈরাচারীও ছিলেন। কেউ দামী দামী মসজিদ এবং তাজমহলের মত শতকোটি অর্থের স্মৃতির সংরক্ষণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে রছূলের (ছঃ) জীবনের আদর্শ তথা হজরত ওমর (রাঃ) জীবনের সুশাসনের স্মৃতিগুলোর অনুকরণ করতে না পারায় আজ ভারতের কথিত মুসলমানদের ঈমানের দরজা এত নিম্নমানের নিয়ন্ত্রণে এসেছে যে তারা আজ জেহাদ ও যুদ্ধ এবং সর্বপরি আল্লাহ পাকের সার্বোভৌমত্বের অধিনে একটি ইসলামী

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের কথা তারা চিন্তা করতে পারে না। বরং ফেকাশাস্ত্রের ফেতনা দিয়ে আলেম সমাজকে বিভ্রান্তের চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। আর এ ফেত্নার অস্ত্র বিশ্বে মুসলমানদের জন্য আজ মারনাস্ত্রের আকার ধারণ করেছে।

সুতরাং পূর্ণাঙ্গ জীবনের জাতীয় দাবিই হলো মুসলমানদেরকে কথিত সংস্কৃতির বাংলা নববর্ষ এবং ইংরেজী নববর্ষের দিন ক্ষনের নামগুলো ইসলামী সংস্কৃতির হিজরী সনের মূল্যবোধের বাধা হিসেবে উহাকে অতি সত্বর বর্জন করতে হবে। কারণ ঐ ইংরেজী বর্ষের মাস এবং দিনক্ষণের নাম উচ্চারণের মাধ্যমে আমরা বহুবিধ প্রাচীন গ্রীক দেব-দেবীদের নামকরণে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের সমাধা করে থাকি। আমরা যদি গ্রীক দেব-দেবীদের নামকরণে অথবা হিন্দুসম্প্রদায়ের দেবতাদের নামকারণের মাস ও দিনক্ষণের নামের সাথে মিলেয়ে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মকে নির্দ্দিষ্ট করে নেই, তবে সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ না হলেও ঐ সম্প্রদায়ের দেবতাদের দর্শণের পরোক্ষ পুজাই করা হবে। মনে রাখতে হবে উহা ইতি পূর্বে কার উদৃত আরবী নামগুলোর অনুবাদিক শব্দার্থ নয়। অথচ মুসলমানরা কথায় কথায় ইওমে জুমাকে শুক্রবার অথবা ইংরেজীতে frigg দেবতার নামকরণে friday বলে নিজকে ধন্য মনে করেন। মাগ-ফাল্গুন মাসের অথবা ইংরেজী **January. February** এর অনুবাদ যে রমজান বা শাওয়াল মাসের অনুবাদ নয়, মুসলমানরা আজ সে কথা বুজিতেই চায় না।

যে হিজরীসন আল-কোরানের অহির মাধ্যমে পাওয়া এবং যে হিজরী সনের মাস ও দিনক্ষণের সাথে আল্লাহ রয়েছে, উহাকে উপেক্ষা করে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের অবকাশ কোথায়? তাহলে কি আমরা আল-কোরানে কিছু অংশ আমল করবো এবং অন্য অংশকে অবিশ্বাস করবো? অংশবিশেষ যে কোরানকে জানা জাবে না এবং এর পরিণাম যে জাহান্নম একথাও আল্লাহ পাক সুরা বাকারায় অহি করে দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ـ

অর্থ ঃ তবে তোমরা কি কিতাবের একাংশ বিশ্বাস কর এবং অপর অংশকে কর অবিশ্বাস? জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে যাদের এরূপ আচরণ হবে তাদের এতদ্ব্যাতিত আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তোমরা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে" (বাকারা-৮৫).

মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকের মহাকালের মাঝে থেকে, কালসৃষ্টির চন্দ্র;সূর্য্যের উদয় অস্তের সাথে সর্ম্পকীত হিজরীসনের দিনক্ষণের বিষয় মানবো না, এমনকি তো পূর্ণাংগ ইসলাম কে মানা হয় না। পাঠকরা হয়তো বলবেন যে, আল্লাহ পাকের বিধানের নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি বিষয় গুলো আমরা হিজরীসনের অনুকরনেই করে থাকি।

www.pathagar.com

কথাটি আংশিক সত্য। নামাজ রোজা, হজ্জ যাকাত যেটুকু করি উহা সবটাই ইংরেজীবর্ষের অথবা বাংলা বর্ষের দিনক্ষণের অনুকরণে; যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। পাঠকরা হয়তো বা একথাও বলতে পারেন ইংরেজী বর্ষে অথবা বাংলা বর্ষে কি চন্দ্রসূর্যের অবদান নেই। অবশ্যই আছে। কিন্তু উহার সাথে দেব-দেবীদের নামকরণ করে যে শিরক আমরা করছি উহাতে পরকালের মুক্তি আসা করা যাবে না। হিজরী হচ্ছে গুণবাচক এবং গণিতিক বৈশিষ্টে, আর ইংরেজী এবং বাংলা বর্ষগুলো হচ্ছে দেব-দেবীদের নামকরণে। চন্দ্রসূর্যের উদয় আস্তে যেমন কোন ভৌগলিক সীমার চিহ্নিত করণের বিষয় নেই; অথবা জাত অজাতের অথবা সাদা-কালোর বিবেচনা নেই সেক্ষেত্রে হিজরীসনের আন্তজাতিক অবদানে বিশ্বয়নের যে দাবি উঠেছে উহা বাস্তবায়নে এই হিজরীসনের ব্যবহারই বিশেষ বিবেচনা রাখে।

আল্লাহ পাক বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে উহার ভিতরে রেখে দিলেন লক্ষ্য কোটি মাখলুকাত। ঐ সৃষ্ট মাখ্লুকাতের নিয়ন্ত্রণে এমন নীতিমালা বেধে দিলেন যাতে কোন গ্রহ গ্রহন্তরে মিলে না যায় এবং সূর্য্য ও চন্দ্র তার বলায় থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে এমনটি হয় নাই। মাধ্যাকর্ষণ বিধির (Law of gravitation) ব্যাপক ধারণ শক্তি থেকে পৃথিবী নামক গ্রহটি তার বিধির বাধন থেকে ছিটকে গিয়ে অন্য গ্রহ বা উপ গ্রহকে গ্রাস করবে তেমনটি হয় নাই। বস্তু ও শক্তির নিত্যতা বিধি (Law of conoervotion of moss and energy) তে এমন কোন পরিবর্তন প্রতিয়মান হয় নাই যাতে আমরা কোন দিন লবণকে চিনি ভেবেছি অথবা আলোর গতিকে বক্র বিবেচনায় আলো নয়, তেমন কিছু ভাবতে পারি। সৃষ্টি মাখ্লুকাতের নিয়ন্ত্রনে এমন আইন বেধে দিলেন যাতে পাখি হেটে বেড়ায় না। মাছ ডাংগ্রায় বিচরন করতে শিখে নাই। ঐ নিয়ম নীতিতে এও অনুভূত হয় নাই যে, কেউ পানি পানে উহাকে তিতা বা টক শাদে তৃপ্তি পেয়েছে অথবা যৌনাবেগে যে জীবনের সৃষ্টি; ঐ জীবন উহার জীবিকা ব্যতিত চলছে; আল-কোরানেও আল্লাহ তায়ালা এ বিধানগুলোর উপস্থাপনা করেছেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনায়; যাতে সে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়গুলোকে অনুধাবন করতে পারে। কারণ ঐ বিধানাবলি মানার মধ্যেই মানুষ যেমন তার ইহকালিন শান্তি পেতে পারে, তেমনি তার শ্রেষ্ঠত্বকেও ধরে রাখতে পারে। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ, শ্রেষ্ঠ নয়, এমন কোন সৃষ্টিকে দেবতাগন্যে পুজার মাধ্যমে সে তার শ্রেষ্ঠত্বকে ধরে রাখতে পারে না।

বারটি মাসের যে বিধান আল্লাহ মানুষের জন্য বেধে দিলেন উহা সম্পূর্ণটাই আল্লাহর সৃষ্টি চন্দ্র ও সূর্যের সাথে সম্পর্কিত। আর চন্দ্র সূর্য্যের উদয় অস্তের যে কাল বা সময় উহারই মাঝে আল্লাহ মানুষের সামগ্রীক উন্নতির অবকাশ রেখে দিয়েছেন। চন্দ্রের ও সূর্য্যের উদয় অস্তের অনন্তর ধারা ব্যতিত যেমন মানুষ তার মৌলিক এবাদত ছালাত,

www.pathagar.com

ছিয়াম, হজ্জ্ব ইত্যাদি করতে পারে না; তেমনি উহাদের বাদ দিয়ে মানুষের রেজেক সংক্রান্তের কোন দ্রব্য উৎপাদন করা যায় না। চন্দ্র সূর্য্য মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে; অথচ মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে উহাকে দেবতা গন্যে পুজা করবে মুসলমানদের কাছে উহা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং নীতিগতভাবেই মুসলমানদের কে প্রকৃতির সৃজন হিজরীসনকে মেনে নিতে হয়। প্রকৃতির বিষয়গুলো যেমন ভৌগলিক সীমায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; তেমনি আল্লাহর বিধানের হিজরী বছর কোন ভূখণ্ডের একক বিষয় নয়। মানুষ বিশেষ করে মুসলমানদের ঐক্যের কারণে তাদের প্রতিটি কাজে হিজরীসনের অনুকরনই আল্লাহ পাকের সূরা আল-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ

("তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ রুজ্জুকে অর্থাৎ দ্বীনকে শক্ত করে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না") নির্দেশটি বাস্তবায়ীত হতে পারে।

নতুবা দেশজ সংস্কৃতির বর্ষানন্দের বিষয়গুলোর অনুকরণ আকিদাগত কারণে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে এবং রাখছে। মনে রাখতে হবে দেশজ মেকি সংস্কৃতি সংকির্ণতার কারণে কুসংস্কারকেই জন্ম দেবে যা কোন অবস্থায়ই মুসলমান তথা মানবতার মানদন্ড হতে পারে না।

কথিত মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা তাদের মস্তকভিত্তিক বুদ্ধির কারণে আল্লাহর কোরানের বর্হিভূত বিধান দিয়ে যেভাবে ইংরেজী এবং বাংলা বর্ষের নবায়ন করতে চান, আল-কোরানের আবির্ভাবের পরে এহেন নবায়নের কোন নির্দেশ নেই। ঐ সকল বিভ্রান্তকারী বুদ্ধিজীবিদের প্রসঙ্গে একটি গল্পের অবতারণা করা যেতে পারে।

গল্পটি নিম্নরূপ ঃ

"বনের একটি বাঘ তার বাচ্চাটিকে এ বলে উপদেশ দিচ্ছে যে, তোমাকে অন্য কোন প্রাণীকে ভয় করতে হবে না কেবলমাত্র দুই পা বিশিষ্ট একটি প্রাণী ছাড়া। তারা হলো মানুষ প্রাণী। কারণ তাদের Brain আছে। একদিন বাচ্চাসাবকটি একটি মানুষ প্রাণীকে আক্রমন করলো এবং তাকে প্রায় হত্যার উদ্দোগ নিলো। তখন বাচ্চা শাকবটি তার পিতার উপদেশটি স্বরণ করলো এবং লোকটিকে বল্‌লো যে, আমার পিতা তোমাদের সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করে গেছে। তুমি কি আমাকে তোমার Brain দেখাতে পারবে?

তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেবো। লোকটি বললো! হ্যা! অবশ্যই। কিন্তু আসলে আমার Brain কে বাসায় রেখে এসেছি। তুমি যদি আমাকে কিছুক্ষনের জন্য ছেড়ে দাও তা হলে আমি বাড়িতে গিয়ে Brain টি নিয়ে আসতে পারি। বাঘ সাবক লোকটির কথায় রাজি হয়ে তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হলো। লোকটি তখন শাবকটিকে বল্‌লো ঃ তুমি

www.pathagar.com

হয়তো এখান থেকে চলে যেতে পার। Brain নিয়ে এসে তোমাকে যদি আমি না পাই এবং আমি তোমাকে একটি গাছের সাথে বেধে রাখি যাতে তুমি অন্য কোথাও চলে যেতে না পার। বাঘ সাবক লোকটির কথায় রাজি হলো এবং লোকটি তখন সাবকটিকে বেধে ফেলো এবং লাঠি এনে শাবকটিকে বেদম প্রহরে মৃত প্রায় করে আনলো শেষ নিঃশ্বাসের আগে বাগ শাকবটি তার পিতার উপদেশটির কথা স্মরণ করলো এবং বললো Be were of nan he has brain. (This is lifted from Training Guid for Isamic workeres by. Hisham Yoha Altalib former Gencral Secrctay. International Islamic Federation A Studend Orgamisation (IIFSO) and a lownding member of Interntional Institantc of Islamic Thouhts. (IIIT).

ঐ গল্পের মন্তব্য করতে গিয়ে ড. আল তালিব সাহেব বলেছেন, Untarunatcly we doxt make full use of the brain we've In some eascs. we leave them bran new, never used! Seriouly scienti fic reasarch has shown that the average man seldom taps into more than 5%-10% of his potentia brain power"

লেখকের বর্ণিত গল্প এবং মন্তব্য থেকে আমি একথাই বলতে চাই যে, আমরা আমাদের Brain কে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বিবেচনায় কাজে লাগাই না। বরং আমরা যেন বাগশাবকটির brain এর মত বিবেচনা করি। অথচ যিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং উহাতে শ্রেষ্ঠ Brain সংযোজন করলেন এবং অহির মাধ্যমে বলে দিলেন ঃ

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ـ

অর্থ ঃ যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছে যা সে জানতো না" (৯৬ ঃ ৪-৫)

মুসলমানদের নববর্ষ কোনটি হবে,– বিভ্রান্ত মুসলিম পাঠকরা যদি আল-কোরানের আলোকে মস্তিকের জ্ঞান দিয়ে উহা বুজতে পারতেন। তা হলে তারা নর্দন কুরদনে অবশ্যই বাগের মুখস পড়ে নবর্ষের আনন্দ করতে পারতেন কি? যারা আল-কোরানের প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়েছে, তারা কোন অবস্থায় কোরানের কোন নির্দেশ পরিবর্তন, পরিবদ্ধন অথবা বর্জন করে ঈমানদার মুস্‌লমান হিসেবে পরিচয় দেয়া যায় না। বরং উহাতে আল্লাহ পাকে নাফরমানিতে নিজেই নিজের গোমরাহী ডেকে আনবে। সুরা আহ্‌যাবে ৩৬ নং অহীর আয়াতে আল্লাহ পাক বলে দিলেন ঃ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَامُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ـ

অর্থ ঃ "কোন মুমেন পুরুষ ও কোন মুমেনা স্ত্রীলোকদের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন, তখন সে নিজের সেই

www.pathagar.com

ব্যাপারে নিজে কোন ফয়সালা করবার ইখতিয়ার রাখবে। আর যে লোক আল্লাহ ও তার রসুলের নাফরমানী করবে সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ঠ গোমরাহীতে লিপ্ত হলো।" (৩৬)

বর্ষ সংক্রান্তে আল কোরানের আয়াতগুলোর নির্দেশকে বর্জন করে মনগড়া নববর্ষাদীর মাধ্যমে যে আনন্দ উৎসবের সংস্কৃতবাদীর আয়োজন উহা মুসলমানদের কে যে বিভ্রাট বা গোমরাহীর মাঝে ফেলে দিয়েছে উহাতে অপসংস্কৃতির আধিক্য এত বেশী এসেছে যে, মুসলমানরা আজ বুজতে পারছে না যে তারা তাদের অজ্ঞাতে ঐ অপসংস্কৃতির আধিক্যে কি ধরনের শিরক করে যাচ্ছে। যে আল্লাহ সামগ্রীক শান্তির জন্য চন্দ্র সূর্য্যের উদয় অস্তকে নির্দিষ্ট করেছেন, সেই আল্লাহর দেয়া রাত্র ও দিবসকে তাদের কর্মের বিভ্রান্তির মাধ্যমে রাত্রের ঘুমকে হারাম করে তারা এখন রাত্রের ঘুমকে দিনে নিয়ে সকালে ফজরের ছালাত থেকে নিজদেরকে বঞ্চিত করে ফেল্‌ছে। অপসংস্কৃতি অসংখ্যা TV Programmc দেখে যারা রাত্রের শেষ প্রহরে ঘুমাবে তারা কি করে ফজরের জামাত আদায় করবে? আল্লাহ বলেন,

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ـ

অর্থ ঃ "রাত্রির আবরণ করে রঙ্গিন প্রভাতের তিনিই উন্মেষ করেন, তিনিই রাত্রিকে শান্তির সময় বানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই চন্দ্র ও সূর্যের উদয় অস্তের হিসেব নির্দিষ্ট করেছেন; বস্তুত এই সবই সেই মহা প্ররাক্রমশীল ও মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত পরিমান" (৬ ঃ ৯৬).

ঐ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে মানুষের সামগ্রীক জীবনে চন্দ্র-সূর্যের উদয় অস্তের মাঝেই তাদের শ্রম ও শান্তির বিষয়গুলো বাধা আছে যা হিজরীসনের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন মুসলমানরা এ ধরনের একটি বিভ্রাট বা গোমরাহী থেকে মুক্ত হতে পারছে না? এর উত্তরের জন্য আমি কয়েকটি কারণকে চিহ্নিত করতে পারি। যেমন ঃ

১. ঐশী বানীর প্রতি গবেষণামূলক জ্ঞানের অভাব।

২. রছুল (ছঃ) এবং তাঁর পরবর্তি চার খলিফাদের প্রশাসনিক বিষয়গুলো মূল্যায়ন না করন।

৩. বর্তমানে বিজয়বেশে থাকা অমুসলমানদের আধিপাত্যবাদের বিভিন্ন পরক্রিয়ার প্রভাব।

ঐ কয়টি কারণে মুসলমানদের ঈমানের যে ফাটল ধরেছে উহাকে সংস্কার করার জন্য আমলের যে বিবেচনা বেধ উহা লোপ পেতে বসেছে। মুসলমানদের যে ধরনের ঈমান ও আমল থাকার দরকার ছিল উহা অমুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের কারণে বেমালুম ভুলে গিয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্বের যে শর্তাদীর চুক্তি সম্পাদন করে উহার সাথে তারা একাত্ব হয়ে আল-কোরানের নির্দেশকে ফেকার মাছালা দিয়ে মূল বিষয় থেকে সরে পড়ে। রছূল (ছঃ) বলেছেন যে, "ইসলাম এবং রাজনীতি দুই সহোদর ভাই।

www.pathagar.com

একটিকে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

আমাদের দেশের আলেম সমাজ ঐ বাস্তবতাকে এখনও পূনাংগভাবে বিশ্বাস করতে পারে নাই বলে বাংলাদেশের মত একটি দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রে আল-কোরানের নির্দেশীত কোন শাসন ব্যবস্থা আজও চালু হতে পারে নাই। বস্তবাদী অমুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতির চাকচিক্যময় মুসলিম দেশগুলো হিনমন্নতায় (Interereocty Complex) ভোগে। অমুসলিম আধিত্যবাদের দেশগুলো তখন মুসলিম দেশগুলোর হিনমন্নতার সুযোগ নিয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়। তখন আল্লাহর ঐশী আদেশের আমল না মেনে বন্ধুত্বে বিবেচনায় অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ পাক তার কিতাবে বলেছেন ঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْ لِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ মুমিনগণ যেন কখনও ইমানদার লোকদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না" (৩ ঃ ২৮).

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলে দিলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ـ

অর্থ ঃ যে সব মুনাফেক লোক ঈমানদার লোকদেরকে বাদ দিয়ে কাফের লোকদেরকে নিজেদের বন্ধু ও সংগীরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে এ সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। ইহারা কি সম্মান লাভের সন্ধানে তাদের নিকট যায়? অথচ সমস্তটাই একমাত্র আল্লাহর জন্য" (৪ ঃ সুর নিসা-১৩৯)

সুরা মায়েদার ৫১ নং আয়াতে বন্ধুদের বিষয়টিকে আরও স্পষ্ঠ করে বলে দিলেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদার লোকগণ! ইয়াহুদী ইসায়ীদের নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ ও করো না। ইহারা নিজেরা পরস্পরে বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তা হলে সে তাদের মধ্যেই গন্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যালেমদেরকে নিজেদের হেদায়েত হতে বঞ্চিত করেন। (৫ ঃ ৫১)

কালেমা পাকের এ ধরনের একাধিক নির্দেশ থাকাসত্বে মুসলমানরা আজ ইয়াহুদী নাছারাদের সংস্পর্শে এসে Progresive হতে গিয়ে শুধু বর্ষবিভ্রাটেই নয়; অধিকন্ত মৌলিক এবাদতের ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাতের মত এবাদতগুলোর প্রতি তাদের

www.pathagar.com

তেমন আগ্রহ নেই।

মুসলমানরা আজ আধিপত্যের আবর্তে অধিনস্ত হয়ে শুধু রাজনৈতিক, বা অর্থনৈতিক অংগনেই নয়; অধিকন্ত আধ্যাতিক ও সংস্কৃতিক সমাজ সৃষ্টির হিজরী বছরকে উপেক্ষা করে নিজ নিজ ভৌগলিক সীমায় দেশজ সংস্কৃতির নামে বহু ধরনের বর্ষ পরিক্রমা তৈরী করে হিজরী বর্ষের মাস, দিনগুলোর সাথে ধর্মীয় যে নির্দেশাদী রয়েছে উহা থেকে ক্রমন্নয় দূরে সরে যাবার কারণে আল্লাহর আনুগত্যের পূর্ণতা প্রাপ্তি হচ্ছে না। অথচ কালামে পাকের শুরুতে আল্লাহ পাক বলে রাখলেন ঃ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থ ঃ ইহা আল্লাহ তায়ালার কেতাব। ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। ইহা জীবন যাপনের ব্যবস্থা। সেই মুত্তাকী লোকদের জন্য" (২ ঃ ২)

হুজুর পাক (ছঃ) বলেছেন ঃ

"এমন দিন নিকটে যখন ইসলামের কিছুই থাকবে না শুধু নাম ছাড়া ও কুরআনের শুধু বাহ্যিক রূপ ছাড়া এবং মুসলমানদের মসজিদগুলো জ্ঞান ও ভক্তিশূন্য হবে। বিদ্যান ব্যক্তিরা বিশ্বের নিকৃষ্ঠতম প্রকৃতির হবে। তাদের মধ্য হতে বিবাদ ও সংগ্রাম সূচিত হয়ে উহা তাদেরই উপর আপর্তিত হবে"। মুসলিম বিশ্ব দেখে মনে হচ্ছে যেন হুজুর পাকের (ছঃ) ঐ বাণীই বাস্তবায়নের শেষ পর্য্যায় এসে গেছে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

১৯৪১ সালে বরিশাল জেলার সদর থানায় আলেকান্দা নামক গ্রামে লেখক মোঃ সিরাজুল ইসলামের জন্ম। পৈত্রিকভাবে মুসলিম ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ 'তালুকদার বাড়ীর' ধর্মীয় পরিবেশে মানুষ। জৈনপুরের পীরদের খাদেম পিতার তৃতীয় সন্তান। পিতার নাম মোঃ ইছমাইল তালুকদার। বরিশালের ব্রজমোহন মহাবিদ্যালয় থেকে বি.এ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে এল.এল.বি। ১৯৬৭ সালে বরিশাল জেলাবারে যোগদান এবং ১৯৬৯ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বি.সি.এস (বিচার) বিভাগের মাধ্যমে বিচার বিভাগে যোগদান। তারপর তিনি জেলা জজ হিসেবে দীর্ঘদিন চাকুরি শেষে অবসর গ্রহন করেন। বিভিন্ন কর্মস্থলের প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রবন্ধকার হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। প্রবন্ধের উপর প্রচেষ্টারত প্রয়াস পরবর্তীতে পুস্তক লিখতে উদ্বুদ্ধ করে এবং সেই হিসাবে ইতিপূর্বে লেখক ১. ইসলামের তওবার বিধান ২. ইসলাম ও সংগীত ৩. আল কোরানীক আইন ৪. ইসলাম ও আনন্দ ৫. বেহেস্তে কে যাবেন ৬. বিচারসুলভ মন (Judicial Mind) ৭. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ৮. নারী এবং চাকুরীজীবি নারীদের আইনগত অধিকার ৯. ভাষা বিভ্রাটে মানুষ ১০. বর্ষ বিভ্রাটে মুসলমান ১১. নামাজ কি এবং হালাল রিজিক কেন পুস্তকগুলো লিখেছেন। লেখকের হাতে আরও বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আছে যেমন- ১. ইকরা ২. মানব মূল্যায়ন ৩. ফুল সন্দর্শন ৪. মানবতার বিচার ৫. মুরতাদ এবং রাসফ্যামী আইন ৬. ইসলাম ও বন্ধুত্ব ৭. সাপ্তাহিক ছুটি এবং ইয়াওমে জুমা। লেখক প্রতিটি পুস্তকে কোরানের তথ্যকে মানুষের জীবনে ব্যবহার উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন। ঐ ধরনের উপস্থাপনায় ইসলাম যে অনুষ্ঠান সর্বস্ব কোন ধর্ম নয় এ আলোচনাই এসেছে বেশী। লেখকের মূল কথা হলো কোরানের কথা মানুষকে কোরানের ভাষা দিয়েই বুঝতে হবে। এ পুস্তকটিও ঐ নীতিবোধ থেকে লিখিত হয়েছে। গ্রন্থ রচনার ধারাবাহিকতার বজায় রাখতে লেখক অত্যন্ত আগ্রহী। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কাম্য।

- *প্রকাশক*

প্রকাশক ও পরিবেশক
ইখওয়ান লাইব্রেরী
৩৪/২, নথব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৩২৩৮

ISBN - 984- 8342-02-8